অষ্টম অধ্যায় - -

১। অবনীন্দ্র নাথের সাহিত্য চর্চ্চা (বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ, কোন প্রয়োজনে বা প্রেরণায় কি কি গ্রন্থ রচনা)

২। ভারতী গোষ্ঠীর অন্যতম রূপে অন্যান্য লেখকদের সঙ্গে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য ।

৩। প্রাবন্ধিক অবনীন্দ্রনাথ -

৪। অবনীন্দ্রনাথের যাত্রা পালা — নাটক কথকতা ।-

৫। স্মৃতিচিত্র জাতীয় গ্রন্থ ।

অষ্টম অধ্যায় -

১) অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্য চর্চা - বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ —

(কোন প্রয়োজনে বা প্রেরণায় কিকি গ্রন্থ রচনা)

বাল্য গ্রন্থাবলী রচয়িতা অবনীন্দ্রনাথ' বাল্য গ্রন্থাবলী' রচয়িতা অবনীন্দ্র - নাথের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ' শকুন্তলা' মুদ্রিত হয় ১৮৯৫ খৃঃ । এর আগেই শিশু সাহিত্যের দরবারে এসে গেছেন' যোগীন্দ্রনাথ সরকার' তাঁর' হাসি ও খেলা' (১৮৯৪ খৃঃ) নিয়ে - রবীন্দ্রনাথ ভূমিকায় লিখলেন —'' বাংলা ভাষায় — এরূপ গ্রন্থের বিশেষ অভাব ছিল'' যোগীন্দ্রনাথ নীতি নয়, শিক্ষা নয় শুধুমাত্র আনন্দের খোরাক জোগাবার ভার নিয়ে আসরে নামলেন । বাংলার অন্তঃপুরের ঠাকুমা দিদিমার মুখের ছড়া আর অবসর যাপনের রূপকথা হ'ল তাঁর মূলধন । মৌলিক রচনার ক্ষেত্রে তাঁর সহযোগী হলেন রাজকৃষ্ণ রায় , প্রমদাচরণ সেন , উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী , নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি । এঁদের রচনাগুলি সঙ্কলিত হয়ে প্রকাশিত হল' হাসি ও খেলা' হিতোপদেশ'- পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ তথা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা - সাগরের যুগ পর্যন্ত' শিশু সাহিত্যে' আস্বাদ্য কোন বস্তু ছিল না, বালকদের জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনাতেই তাঁদের দায়িত্ব শেষ হয়েছিল । যোগীন্দ্রনাথ , উপেন্দ্রকিশোর প্রভৃতি প্রথম বালক মনোরঞ্জনের সাধু উদ্দেশ্যে গল্প , কবিতা , ছবি লেখা ও আঁকায় উৎসাহী হলেন । রবীন্দ্রনাথ শিশুমনোরঞ্জনের প্রয়োজন সম্পর্কে সম্যক অবহিত হলেও তাঁর মেজাজ ছিল স্বতন্ত্র শ্রেণীর , শিশু পাঠকের মন যেখানে পৌঁছতে পারে না ।

কাজেই অবনীন্দ্রনাথ যখন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে নির্দেশ পেলেন যে জোড়াসাঁকোর

বাড়ীর নীচতলার ঘরে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত শিশু বিদ্যালয়ের[1] জন্য বাল্য গ্রন্থাবলী রচনা করতে হবে তখন তাঁর সামনে বাংলা ভাষায় উন্নত মানের শিশু সাহিত্যের নিদর্শন - কিছুই ছিল না । রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এ' সম্বন্ধে আজীবন উৎসাহী হ'লেও শিশুমনের উপযোগী সহজ , নির্ভার রচনা রবীন্দ্র সাহিত্যে দেখা যায় না । রবীন্দ্রনাথের নদী' কবিতাকে শিশুবোধ্য বলা যায় না, গল্পগুচ্ছের' ছুটি' পোষ্টমাষ্টার , শিল্পী ব্যবধান , অতিথি প্রভৃতি গল্পের নায়ক নায়িকা কিশোর বয়স্ক হ'লেও তাদের আবেদন বিদগ্ধ রসিক চিত্তে । আর জ্ঞানদানন্দিনী দেবী প্রকাশিত' বালক পত্রিকা বালকদের জন্য প্রকাশিত হলেও ''বালক'' নামে মাত্র বালক' ছিল প্রকৃতপক্ষে ইহা বয়স্ক পাঠকদিগেরই উপযোগী হইয়া উঠিয়াছিল ।[2]'- - - তাই বালক প্রকাশিত হওয়ার দুই তিন বছরের মধ্যেই ভারতীয় অভ্যন্তরে অনায়াসে বিলুপ্ত হ'তে পেরেছিল ।-

প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের মৌখিক উৎসাহে এবং তাঁরই প্রয়োজনে অবনীন্দ্রনাথ রচনা শুরুকরেন । রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণী দৃষ্টি অবনীন্দ্র প্রতিভার মূলসূত্রটি খুঁজে পেয়ে - ছিল - তাই বলেছিলেন'' তুমি লেখো না, যেমন করে তুমি মুখে মুখে গল্প করো তেমনি করেই লেখো ।''[3]

১। অবনীন্দ্রনাথ —— ''খেয়াল গেল ছোটদের স্কুল করতে হব । নিচের তলায় ক্লাসঘর সাজানো হ'লো বেঞ্চি দিয়ে , ঝগড়ু চাকর ঝাড়পোঁছ করছে, ঘন্টা জোগাড় হলো, ক্লাস বসবে ।- - - - - ছেলেদের উপযোগী বই লিখলেন, আমাকেদিয়েও লেখালেন ।''- ঘরোয়া - ১ম সং (২০৪৮) পৃ : ১৫৩

২। স্বর্ণকুমারী দেবী - সম্পাদকীয় ভারতী ও বালক ১২৯৩ বৈশাখ পৃ : ১

৩। অবনীন্দ্রনাথ - জোড়াসাঁকোর ধারে (১৩৫৪) পৃ : — ১২২

ভবিষ্যতের কথক অবনী-দ্রনাথ , বাণীশিল্পী অবনী-দ্রকে তিনি চিনতে পেরেছিলেন তাই সঠিক পথ চলবার নির্দ্দেশটুকু এসেছিল তাঁরই সুচিন্তিত দূরদৃষ্টির ফলে ।

'শকুন্তলা' ও 'ক্ষীরের পুতুল' রচনার আগেই অবশ্য অবনী-দ্রনাথ দুটি পুরাণ কথা অবলম্বনে কাহিনী রচনা আরম্ভ করেছিলেন -'' শ্রীকৃষ্ণকথা' এবং নলদময়ন্তী । অবনী-দ্র নাথের পুরাতন লেখা যার রচনাকাল আনুমানিক ১৮৯২ — ৯৩ খৃ : তার মধ্যেই এই লেখা দুটি পাওয়া যায় । পুরাণের কথাবস্তু ধর্ম্মীয় আবরণ মুক্ত করে রূপকথা হয়ে উঠছে তার সূচনাতেই এই রচনাদুটির মূল্য ।-

কাহিনী নির্ব্বাচনে অবনী-দ্রনাথ কোন নূতনের সন্ধানে যাননি। সাহিত্য রচনার সূচনা থেকে আরম্ভ করে শেষ জীবনের ভ যাত্রাপালা নাটক কথকতা পর্য্যন্ত মৌলিক কাহিনীর অবতারণা বিরলা -। কখনো সংস্কৃত সাহিত্য কখনো ইতিহাস কখনো রামায়ণ কাহিনী, কখনো রবী-দ্র রচনা তাঁর সৃষ্টির উৎস হয়েছে । দূর আকাশের ধ্রুবতারার মতো রবী-দ্র ভাব প্রেরণা তাঁর সাহিত্যধারাকে এক নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে গেছে , উদ্ভাসিত করেছে অপূর্ব্ব আলোকে । কখনো সচেতন ভাবে , কখনো অবচেতন প্রেরণায় রবী-দ্র ভাবধারার অনুগমন করেছেন । কিন্তু একথাও সত্য যে অবনী-দ্রনাথের শিল্পীমানসকে পরিপূর্ণভাবে রবী-দ্র প্রভাবের সৌরমণ্ডলে বিলুপ্ত হ'তে দেয়নি । ভাবজগতে রবী-দ্র পরিমণ্ডলের হয়েও গদ্যভাষার স্বতন্ত্রের জন্য বিশিষ্ট অননুকরণীয় হ'য়ে আছেন । রবী-দ্রনাথের মত রবী-দ্র রচনার অন্তরালে তাঁর অবলুপ্তি ঘটেনি ।

খামখেয়ালীর যুগে অবনী-দ্রনাথ যখন বাল্য গ্রন্থাবলী রচনা শুরু করলেন তখন জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের সাহিত্যিক আবহাওয়ায় শেলী কীটস্ মুর বায়রণের সঙ্গে

বৈষ্ণবপদাবলী এবং কালিদাসের প্রভাব খুব বেশী। উভয় সাহিত্যের রোম্যান্টিক ধর্মই তরুণ কবিদলের আকর্ষণীয় বস্তু ছিল। আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সংস্কৃত সাহিত্যের রত্নভাণ্ডার উজাড় করে অনুবাদ করে চলেছিলেন একের পর এক। সেইজন্য পঁচিশ বৎসর বয়সে অবনীন্দ্রনাথ যখন নতুন যুগের ছবির বিষয়বস্তু নির্বাচনে অনুসন্ধিৎসু হলেন তখন রবীন্দ্রনাথই তাঁকে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির পদাবলী রূপায়ণে উৎসাহিত করেন।''রবিকাকা আমাকে এই পর্যন্ত বাতলে দিলেন যে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির কবিতাকে রূপ দিতে হবে।''[8] তারই ফল ১৮৯৫ – ৯৬ খৃঃ অঙ্কিত কৃষ্ণলীলার চিত্রাবলী। চিরযুগের চিরনবীন রোম্যান্টিক নায়ক নায়িকার গীতিকাব্য থেকে তাঁর পদক্ষেপ কালিদাসের কাব্যে। আঁকলেন মেঘদূতের বিরহী যক্ষ, ঊর্ধ্বকাশে সিদ্ধ ও সিদ্ধাঙ্গনা, আসীন যক্ষ, চন্দ্রালোকে সঙ্গীত সভা, ঋতুসংহারের অভিসারিকা, বিরহী পথিক ইত্যাদি। এই রোম্যান্টিক ভাবপ্রেরণার মূলে দাঁড়িয়ে রইলেন রবীন্দ্রনাথ।-

সেই কারণেই বাল্যগ্রন্থাবলী রচনার শুরুতেই তাঁকে আকৃষ্ট করল কালিদাসের অমর নাটক অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্। অবনীন্দ্রনাথের শকুন্তলা, রচনার আগে ও পরে (১৩০২ বঙ্গাব্দ, ১৮৯৫ - ৯৬ খৃঃ) বহুমনীষীই'শকুন্তলা' কাহিনীর তত্ত্ব ও সৌন্দর্য্য বিচারে অগ্রণী হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের'শকুন্তলা' মিরান্দা এবং ডেসডিমোনা (১৮৭৫ খৃঃ) চন্দ্রনাথ বসুর'অভিজ্ঞান-শকুন্তলের অর্থ (১২৮৮ বঙ্গাব্দ) রবীন্দ্রনাথের মেঘদূত (১৩০৮) শকুন্তলা (১৩০৯) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের'কালিদাস ও ভবভূতি (১৩১৭) এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর

8। অবনীন্দ্রনাথ - জোড়াসাঁকোর ধারে (১৩৫৪) পৃঃ ১২৮.

''দুর্ব্বাসার শাপ'' (১৩২৪ বঙ্গাব্দে) প্রভৃতি সবই শকুন্তলার তত্ত্ব ও সাহিত্য সৌন্দর্য্য বিচার। এঁদের প্রায় প্রত্যেকের আলোচনাতেই সমাজ কল্যাণ ও সাহিত্য সৌন্দর্য্য ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। বস্তুতঃ ঊনবিংশ শতক এই দুইকে পৃথক করে দেখেনি। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ শকুন্তলার তত্ত্ব নয়, সৌন্দর্য্য ও কল্যাণ আদর্শের গভীর রহস্যের বিশ্লেষণে মনোনিবেশ করলেন না। তাঁর রচনাকে আক্ষরিক অনুবাদ বা ভাবানুবাদ কোনোটাই বলা যায় না; তিনি 'শকুন্তলা' উপাখ্যানটি গ্রহণ করেছেন মাত্র, এবং ঘটনাগত সঙ্গতি বজায় রেখে, মূল পরিরস বিস্তার করেছেন।-

এই প্রসঙ্গে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখ যোগ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনুবাদ শকুন্তলা। অভিজ্ঞান শকুন্তলমের-বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে, অবনীন্দ্র নাথের জন্মের বহু পূর্ব্বে। অবনীন্দ্রনাথ যখন শকুন্তলা রচনা করেছেন, তখন স্বাভাবিক ভাবেই দেখি - বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা বহুল প্রচলিত এবং ছাত্রপাঠ্যরূপেও প্রচারিত। এ' সম্বন্ধে তাঁর জীবনীকার-দ্বয়ের উক্তি উদ্ধৃতি যোগ্য বলে মনে করি।'' এ অনুবাদের তুলনা নাই। অভিজ্ঞানশকুন্তলের সংস্কৃত যেমন মধুর, এই শকুন্তলার বাঙ্গালা তেমনই মধুর এককথায় বলি, অভিজ্ঞান' শকুন্তলা' পড়িয়া যাহা বুঝিতে নাই, ইহাতে তাহা বুঝিয়াছি।''[৫]

যথার্থ সাহিত্যরস পরিবেশনে এবং লিপিকুশলতায় শকুন্তলা যে ধন্য হয়েছিল অপর একটি মন্তব্য তার প্রমাণ।'' শকুন্তলা সমাগমে বাঙ্গালা সাহিত্য এক অপূর্ব্ব নূতন শ্রীধারণ

৫। বিহারীলাল সরকার - বিদ্যাসাগর - পৃ: (২৭৫)।

করিল। বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে কিশোরীর বাল্যলীলায় যৌবনের নবোদগম দেখা দিল। শকুন্তলায় তাঁহার লিপিচাতুর্য্য, রচনামাধুর্য্য ও পদলালিত্য দর্শনে পাঠকমাত্রেই মোহিত হইয়া গেলেন এবং চারিদিকে তাঁহার প্রশংসা বিস্তৃত হইয়া পড়িল।''[৬]

'শকুন্তলা রচনা সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন —''লিখলুম একবোঁকে একদম শকুন্তলা বইখানা। লিখে নিয়ে গেলুম রবিকাকার কাছে, পড়লেন আগাগোড়া বইখানা ভালো করেই পড়লেন। শুধু একটি কথা '' পদ্মলের জল'', ওই একটি মাত্র কথা লিখেছিলেম সংস্কৃতে। কথাটা কাটতে গিয়ে না। থাক বলে রেখে দিলেন।''[৭] অতএব 'শকুন্তলার' প্রথম পাঠক ও সমালোচকও বলতে পারি রবীন্দ্রনাথ। লিখিত ভাবে সমসাময়িক পত্র পত্রিকায় 'শকুন্তলা' সম্বন্ধে কোন আলোচনা এখনও পর্যন্ত দৃষ্টি গোচর হয়নি। সম্ভবত: সেই "high seriousness" এর যুগে শিশুপাঠ্য গ্রন্থ বলে অবজ্ঞাত হয়েছিল।

কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলা' বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনার মতই আকর্ষণীয় হয়ে উঠল উপস্থাপনা এবং চিত্র সৌন্দর্য্যে। বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং অবনীন্দ্রনাথ উভয়েই নাটকীয় কাহিনী কে নাটকীয় আকারে না রেখে গদ্যে বিবৃত করেছেন। এক্ষেত্রে অনেকসময় লেখককে কোন কোন মূল অংশ বর্জ্জন করতে হয়। বিদ্যাসাগর এবং অবনীন্দ্রনাথ উভয়েই গদ্যের পক্ষে অযৌক্তিককাহিনী বাদ দিয়েছেন। যেমন — মূল নাটকের প্রারম্ভে সূত্রধর ও নটীর সলাপ।[৮]

ঈশ্বরচন্দ্র শকুন্তলা নাটকের সাত অঙ্কের ঘটনাকে সাতটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন।

পাদটীকা: — ৬।৭।৮ পরপৃষ্ঠায়

~~৫। বিহারীলাল সরকার - বিদ্যাসাগর পৃ. ২৭৫) দ্রষ্টব্য (ডা. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় - বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর (১ম সং পৃ. ৪৬)~~

শকুন্তলার প্রথম সংস্করণে (১৩০২, শ্রাবণ) এরূপ সুস্পষ্ট পরিচ্ছেদ বিভাগ দেখা দেখা যায় না। পরে প্রথম সিগনেট সংস্করণে (১৩৫৪ খৃঃ)' শকুন্তলা' দুষ্মন্ত' তপোবনে' ও রাজপুরে' মূল এই চারটি পরিচ্ছেদ বিভাগ দেখা যায়। উভয় ক্ষেত্রেই কাহিনীর নাটকীয় আবেগ রক্ষিত হয়েছে।

ছাত্র পাঠ্যগ্রন্থরূপে ব্যবহৃত হতে পারে এই উদ্দেশ্যে ঈশ্বরচন্দ্র আদিরসের বর্ণনা যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করেছেন। অবনীন্দ্রনাথের গ্রন্থ বালকপাঠ্য সুতরাং আদিরসের বর্ণনা তিনি বর্জন করেছেন। বিদ্যাসাগরের নৈয়ায়িক মন অলৌকিক বর্ণনাও বর্জন করতে চেয়েছে। ''শকুন্তলা যখন দুষ্মন্তপুরে যাইবার উদ্যোগ করেন তখন তাঁহাকে সজ্জিত করিবার জন্য কবি কালিদাস দেবপ্রদত্ত অলঙ্কারের সৃষ্টি করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহা পরিত্যাগ করিয়াছেন।''[১] বিদ্যাসাগর মহাশয় কেবল বলেছেন -'' অনসূয়া এবং প্রিয়ম্বদা, যথা - সম্ভব, বেশভূষার সমাধান করিয়া দিলেন।[১০] 'কিন্তু অবনীন্দ্র নাথের' শকুন্তলা যাদের জন্যে লিখিত তারা সম্ভব অসম্ভব, লৌকিক - অলৌকিকের বাধা মানে না, অবনীন্দ্রনাথ ও সেই একই মানসিক গঠনের অধিকারী — তাঁর মনোরাজ্যেও সম্ভব অসম্ভব, লৌকিক অলৌকিকের কোনো প্রভেদ নেই সেইজন্য তিনি অনায়াসে বর্ণনা করেছেন '' প্রিয়ম্বদা কেশর

৬। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় - বিদ্যাসাগর (১৮৯৫) পৃ: ১৬১

৭। অবনীন্দ্রনাথ - জোড়াসাঁকোর ধারে (১ম সং) পৃ: ১২৩

৮। দ্রষ্টব্য — ডা: রসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় - বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর।

৯। বিহারীলাল সরকার — বিদ্যাসাগর — পৃ: ২৭৬

১০। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর —' শকুন্তলা'— (বিদ্যাসাগর - রচনা সম্ভার - প্রমথনাথ বিশী - সম্পাদিত - (২য় সং) - পৃ:- ৯২)

ফুলের হার নিলে ; অনসূয়া গন্ধফুলের তেল নিলে ; দুই সখীতে শকুন্তলাকে সাজাতে বসল । তার মাথায় তেল দিলে, খোঁপায় ফুল দিলে, কপালে সিঁদুর দিলে, পায়ে আলতা - দিলে, নতুন বাকল দিলে ; তবু তো মন উঠল না । সখীর একি বেশ করে দিলে ? প্রিয়সখী শকুন্তলা পৃথিবীর রাণী , তার কি এই সাজ ? - - - - - - হায়, হায়, মতির মালা কোথায় ? হীরের বালা কোথায় ? সোনার মল কোথায় ? পরণে শাড়ি কোথায় ?

বনের দেবতারা সখীদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন , বনের গাছ থেকে সোনার শাড়ী উড়ে পড়ল , হাতের বালা খসে পড়ল, মতির মালা ঝরে পড়ল, পায়ের মল বেজে পড়ল । বনের দেবতারা পলকে বনবাসিনী শকুন্তলাকে রাজ্যেশ্বরী মহারাণীরসাজে সাজিয়ে দিলেন[১১] ।

রূপকথার মতই দুষ্মন্ত এখানে নায়ক রাজা , যার সাতক্রোশ জুড়ে সাতমহলা বাড়ী , তিনি মৃগয়ায় গেলে হাতী সাজে , ঘোড়া সাজে , সহস্র পদাতিকের দল সার বাঁধে তার সঙ্গে চলে প্রিয় বয়স্য মাধব্য । গহন বনে নির্বাসিত অচিন দেশের রাজকুমারীর মতই বনবালা শকুন্তলার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় দুষ্মন্তের — " তারপর কি হ'ল ? পৃথিবীর রাজা আর বনের শকুন্তলা দু'জনের মালা বদল হ'ল । দুই সখীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল[১২] । ''— এই ভাবেই অবনীন্দ্রনাথ' শকুন্তলাকে উপস্থিত করেছেন আটপৌরে সাজে , সহজ ভাষায়, কথার ছবিতে আর ভাষার ছন্দ সাজিয়ে দিয়েছেন । শিশু এবং বয়স্ক উভয় পাঠকের দলই এর

১১। অবনীন্দ্রনাথ — শকুন্তলা (১ম সিগনেট সং) পৃঃ ৩৩ পৃ : -২৪

১২। ঐ ঐ ঐ পৃঃ —২৪

~~১৩। রবীন্দ্রনাথ' নিজের বলেছে পড়িলে মনে হবে আমার বিশ্বাস বাংলা সাহিত্যে চলতি ভাষায় লেখা বই এই প্রথম ।" পরিশিষ্ট যুরোপ প্রবাসীর পত্র শতবর্ষ সং ১৩শখণ্ড পৃ৩৪০~~

থেকে গল্পরস এবং চিত্ররস আকণ্ঠ পান করলেন। যে চলিত ভাষাকে কিছুদিন পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ এনেছেন য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে' [১৩] (১৮৮১ খৃঃ), দ্বিজেন্দ্রনাথ তৎসম শব্দের সঙ্গে সম আসনে দেশী শব্দকে স্থান দিয়েছেন, সেই সহজ শব্দ বয়ন এবং ভঙ্গীকে অবলম্বন করেই যাত্রা শুরু করেছেন অবনীন্দ্রনাথ। সাথের হয়েছে চিত্রশিল্পীর সৌন্দর্যদৃষ্টি এবং বর্ণনা - কুশলতা। বৈঠকী ভঙ্গীতে রূপকথার আমেজ নিয়ে অবনীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলা' আজ পর্যন্তও বোধকরি অননুকরণীয় হয়ে আছে।

বাল্যগ্রন্থাবলী শ্রেণীর দ্বিতীয় গ্রন্থ ক্ষীরের পুতুল *(১৩০২, ফাল্গুন,) অবনীন্দ্রনাথের অন্যতম বৈশিষ্ট্যময়, রচনা। শিশু সাহিত্যের ঐতিহাসিক একে মৌলিক রচনা বলে দাবী করেছেন '— ক্ষীরের পুতুল মৌলিক রচনা এই গ্রন্থের পূর্বে এমন কোনও গ্রন্থ আমরা পাইনা যেখানির উপজীব্য ও চরিত্রগুলি নূতন সৃষ্টি।'' [১৪] বস্তুতঃ ক্ষীরের পুতুল প্রকাশের পূর্ব্বে ছাপার অক্ষরে আমরা রেভারেণ্ড লালবিহারী দে সংগৃহীত ফোক টেলস্ অব বেঙ্গল (১৮৮১ খৃঃ)ছাড়া রূপকথা বা উপকথা জাতীয় অপর কিছু পাইনা। এই গল্পগুলি সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে --

"The tales were published serially in the Bengal Magazine (Vol = 4 - 8, 1875 - 78). Day did not forget to mention the name of persons from whose lips a particular story was heard along with the date and place where it was heard". [১৫]

রেভা: দে মহাশয় প্রধানতঃ লোকমুখে প্রচলিত কয়েকটি রূপকথা সংগ্রহ করে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ করেন। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ রচিত ক্ষীরের পুতুলের' সঙ্গে এর বিশেষ সাদৃশ্য খুঁজে -

১৩। রবীন্দ্রনাথ —" নিশ্চয় বলতে পারিনে তবে আমার বিশ্বাস বাংলা সাহিত্যে চলতি ভাষায় লেখা বই এই প্রথম "— র.রচনা (শতবর্ষ সং)-১০ম খণ্ড, পৃ-৩৪৫

পাদটীকা - ১৪।১৫। পরপৃষ্ঠায়

পাওয়া যায় না । অবনীন্দ্রনাথ প্রথম বাংলা ভাষায় রূপকথার ভঙ্গিমায় গল্প বললেন । লৌকিক সাহিত্যকে কিছুটা পরিবর্তিত করে এক সংস্কৃত বেশে শিক্ষিত সমাজের দরবারে তুলে ধরার এটি তাঁর প্রথম পদক্ষেপ । রূপকথা এবং উপকথার অন্যতম সংগ্রহ দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের ঠাকুরমার ঝুলি (১৯০৭) এবং উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর টুনটুনির বই (১৯১১) ক্ষীরের পুতুলের অনেক পরে প্রকাশিত ।

লোকসাহিত্যের বিশিষ্ট গবেষকের মতে অবনীন্দ্রনাথ ক্ষীরের পুতুল রচনায় লোকসাহিত্যের ঐতিহ্য পুরোপুরি অনুসরণ করেন নি । রূপকথা ব্রতকথা এবং মুসলমানি কেচ্ছার সংমিশ্রণে এটি তাঁর স্বতন্ত্র নিজস্ব সৃষ্টি ।'' অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ক্ষীরের পুতুলের মধ্যে লোকসাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ের রস একত্র সমাবেশ বা একপাত্রে পরিবেশন করতে চেয়েছেন এবং তার মধ্যে কেবল মাত্র রূপকথা, ব্রতকথা এবং ছড়ার উপকরণকেই যে একত্র করেছেন তাই নয় । তাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং বিজাতীয় রসবস্তু এনে সংযুক্ত করেছেন তা মুসলমানী কথা বা কেচ্ছা সাহিত্য ।''[১৬]

ক্ষীরের পুতুলের কাহিনী বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাব যে সুয়োরাণী দুয়োরাণী এবং রাজার অবতারণা থাকলেও কাহিনীর দিক থেকে রূপকথার থেকে ব্রতকথার সঙ্গেই এর সাদৃশ্য বেশী । দুয়োরাণীর পোষ্য বানর মা ষষ্ঠীর কৃপায় এবং নিজের বুদ্ধিবলের ক্ষীরের

১৪। খগেন্দ্রনাথ মিত্র — 'শতাব্দীর শিশুসাহিত্য' — (১৯৫৮) - পৃঃ-২১৬

১৫ Lal Behari Dey - Bengal Peasant Life, Folk tales of Bengal, etc. Edited by - Dr. Mahadeb Prosad Saha - Introduction (st) p- ix

১৬। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য - অবনীন্দ্র নাথ ও বাংলার লোকসাহিত্য' (প্রবন্ধ) রবীন্দ্রভারতী পত্রিকাবর্ষ ১ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ২০৮

পুতুলকে প্রাণময় শিশুতে রূপান্তরিত করেছে। ব্রতকথায় শেষ পর্যন্ত কোন দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়, ক্ষীরের পুতুলের ফলশ্রুতিতেও ষষ্ঠীর মাহাত্ম্য অনুচ্চরিত হলেও স্পষ্ট। কিন্তু ব্রতকথা কোন ধর্মীয় লক্ষ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ব্রতকথার সার্বজনীন মানবিক আবেদন থাকা সত্ত্বেও ধর্মীয় আচারের অন্তর্ভুক্তি হ'য়ে কেবলমাত্র ব্রতপার্বণের ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়। কিন্তু ক্ষীরের পুতুলের এরকম কোন উদ্দেশ্য নেই। কাহিনীর প্রারম্ভে কোন এক নির্বিশেষ রাজ্য, রাজা এবং রাণীর উল্লেখে, এবং সাত সমুদ্র তেরনদী পার হয়ে রাজার মাকের মাণিকের রাজ্য আর মুক্তোর রাজ্যে বাণিজ্যযাত্রায় রূপকথার ভঙ্গিই স্পষ্ট। সুতরাং এখানে ব্রতকথার কাহিনীর মধ্যে রূপকথার ভাষা প্রযুক্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে ব্রতকথার গুণ রক্ষিত হয়নি, বরং ভঙ্গির দিক থেকে মনে হয় ব্রতকথা রূপকথায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে। কিন্তু কাহিনীর উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় (Motif) এবং পরিণতির দিক থেকে ব্রতকথার প্রভাব স্পষ্ট।

যদিও অবনীন্দ্রনাথ ক্ষীরের পুতুল রচনার আরও অনেক পরে 'বিচিত্রা'র যুগে (১৯১৩ — ১৪) মুসলমানী পুঁথি, ছড়া ইত্যাদি সংগ্রহে মনোযোগ দেন তবুও অনেকে ক্ষীরের পুতুলের মধ্যে গোলেবকাওলি'র কাহিনীর প্রভাব অনুভব করেছেন। গোলেবকাওলি যে ঠাকুর পরিবারের পরিচিত গ্রন্থ ছিল সে প্রমাণ আমরা পূর্বেই দিয়েছি, সুতরাং অবনীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই জাতীয় কিসসা কাহিনীর প্রভাব একেবারে অস্বীকার করা যায় না। ''গুলেবকাওলিতে' আছে যে জ্যোতিষী গণনায় দেখা গেছে পূর্বস্তানের অধিপতি জৈনাল মুলুকের সর্বগুণ সম্পন্ন এক পুত্র হবে, কিন্তু রাজা যে মুহূর্তে পুত্র মুখ দর্শন করবেন, সেই মুহূর্তেই রাজা অন্ধ হয়ে যাবেন।

অবনী-দ্রনাথ ও তাঁর ক্ষীরের পুতুলে লিখছেন বানর বল্লে মহারাজ গণনা করেছি ছেলের মুখ এখন দেখলে তোমার চক্ষু অন্ধ হবে।' বাংলাদেশে প্রচলিত রূপকথায় অনুরূপ কোন অভিপ্রায় (Motif) দেখতে পাওয়া যায় না।[১৭]''

অতএব অবনী-দ্রনাথ সঠিক ঐতিহ্যের পথে লোকসাহিত্যের ধারা অনুসরণ করেননি। বরং তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এবং বৈশিষ্ট্য ময় বাকভঙ্গি অনুসারেই ক্ষীরের পুতুল রচনা করেছেন। এই ধরণের রূপকথার ভঙ্গী অনুসারী রচনায় তিনিই পথিকৃৎ। এখানে তিনি রবী-দ্রনাথের দ্বারাও প্রভাবিত হন নি।

ক্ষীরের পুতুলে' রবী-দ্রনাথ সংগৃহীত ছেলেভোলানো ছড়ার প্রভাব প্রত্যক্ষ এবং স্পষ্ট। ক্ষীরের পুতুলে ঘুমপাড়ানি গান ও মেয়েলি ছড়া সাজিয়ে যে গ্রামবালার পরিচয় দিলেন, তার মূলে আমরা রবী-দ্র প্রেরণাই অনুভব করলাম। যে গ্রামবালার সঙ্গে আমরা নূতন করে পরিচিত হচ্ছিলাম গল্পগুচ্ছের পটভূমিকায় আর ছিন্নপত্রের পত্রগুচ্ছে —' ওখানটিতে একটি ছোটোগ্রাম এবং পুটিকতক গাছ, একতীরে পরিপক্ক প্রায় ধানের ক্ষেত, নদীর উচুঁ পাড়ের উপর পাঁচছটি গোরু ন্যাজ দিয়ে মাছি তাড়াতে তাড়াতে কচমচ্ শব্দে ঘাস খাচ্ছে, অন্যতীরে শূন্য মাঠ ধূ ধূ করছে নদীর জলে, শ্যাওলা ভাসছে, মাঝে মাঝে জেলেদের বাঁশপোতা, বাঁশের উপর মাছরাঙা

---

১৭ ড: আশুতোষ ভট্টাচার্য্য অবনী-দ্রনাথ ও বাংলার লোকসাহিত্য। রবী-দ্রভারতী পত্রিকা (বর্ষ ১, সংখ্যা -৩) পৃ: ২৩১

পাখি ছবির মত স্থির হয়ে বসে রয়েছে আকাশে উজ্জ্বল রৌদ্রে একপাল চিল উড়ছে ।[১৮]

(পতিসর , ২১ শে নভেম্বর ১৮৯৫) তাকেই আর একরূপে দেখলাম বানরের দিব্যচক্ষু

দিয়ে - - -''সে এক নূতন দেশ । সেখানে আছে দিঘীর কালোজল আর তার ধারে

শরবন| তেপান্তর মাঠ আর তারপরে আম কাঁঠালের বাগান, গাছে ন্যাজঝোলা টিয়েপাখি

নদীর জলে গোল চোখ বোয়াল মাছ কচুর বনে মশার ঝাঁক । আর আছেন বনগাঁবাসী

মাসীপিসি , তিনি খৈয়ের মোয়া গড়েন , ঘরের ধারে ডালিম গাছটি তাতে প্রভু নাচেন।''[১৯]

উপরোক্ত বর্ণনায় গ্রামবাংলার পরিচয় দানে যেমন রবীন্দ্র প্রেরণার পরোক্ষ প্রভাব , তেমনি

প্রত্যক্ষ প্রভাব , রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত "ছেলেভোলানো ছড়ার"। ছড়া সংগ্রহে পাই --

(১) ''বনগাঁবাসী মাসি পিসি বনের ধারে ঘর

কখনো মাসি বলে না যে খই মোয়াটা ধর ।। ইত্যাদি, এর সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের

বর্ণনার সাদৃশ্য স্পষ্ট । কিংবা

২) দিগ্‌নগরের মেয়ে গুলি নাইতে বসছে ,

(৩) ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি ঘুমের বাড়ী যেয়ো - ইত্যাদি বাক্যাংশের

সাদৃশ্যে অবনীন্দ্রনাথ লিখছেন -

'' দিগনগরে যখন দিন , ঘুমের দেশে তখন রাত । ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি

সারারাত দিগনগরে ষষ্ঠীর দাস ষেঠের বাছা ছেলেদের চোখে ঘুম দিয়ে সকাল বেলা ঘুমের

১৮। রবীন্দ্রনাথ — ছিন্নপত্রাবলী' পত্রসংখ্যা ২৪৪,বি.র.শতবর্ষ সং ১১ শ খণ্ড পৃঃ ২৫৪ -

১৯। অবনীন্দ্রনাথ - - ক্ষীরের পুতুল - ৮ম সিগনেট সং - পৃ : ৭৪

দেশে বাজার মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে , অনেক বেলায় একটুখানি চোখ বুজেছেন এমন সময় ষষ্ঠী ঠাকরুণের ডাকপড়ল । ঘুমের দেশে ঘুমপাড়ানি মাসি জেগে উঠলেন, ঘুমপাড়ানি পিসি উঠে বসলেন , দুইবোনে ঘুমের দেশ ছেড়ে দিঘলনগরে এলেন ।[২০] সোনার তরী কাব্যের অন্তর্গত' নিদ্রিতা' কবিতায় (১৪ই জ্যৈষ্ঠ , ১২৯৯) এই ঘুমের দেশের চিত্রকল্প দেখি -

"যতন করি কনক সূতে গাঁথি -
রতন হারে বাঁধিয়া দিনু পাঁতি ।
ঘুমের দেশে' ঘুমায় রাজবালা
তাহারি গলে পরায়ে দিনু মালা ।"[২১]

রবী-দ্রনাথ এবং অবনী-দ্রনাথ উভয়েই বোধকরি রূপকথা এবং ছড়ার রাজ্যের' ঘুমের দেশ' থেকেই ঘুমের দেশের' রূপকল্প গ্রহণ করেছেন ।-

অতএব আমরা দেখলাম ক্ষীরের পুতুল , লোকসাহিত্যের পথে এসেও ঐতিহ্য অনুসরণ করেনি । এটি অবনী-দ্রনাথের নিজস্ব রোম্যান্টিক সৃষ্টি । রবী-দ্রনাথের ছড়া সংগ্রহের পরোক্ষ প্রেরণায় নূতনত্বের ইঙ্গিত বহনকারী । অবনী-দ্র নাথের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সমুজ্জ্বল ।

অবনী-দ্রনাথেরসর্বশ্রেষ্ঠ পরিচিত গ্রন্থ বোধকরি' রাজকাহিনী' । রাজকাহিনী' র প্রবর্তনা ১৯০৯ খৃঃ[২২] । স্বদেশী ভাবের বন্যায় সারা বাংলাদেশ প্লাবিত । ফুটে ওঠা হ' য়ে -

---

২০। অবনী-দ্রনাথ – ক্ষীরের পুতুল – ৮ম সিগনেট সং - পৃ - ৬২

২১। রবী-দ্রনাথ - নিদ্রিতা -(সোনারতরী) রবী-দ্র রচনা শতবর্ষ সং , ১মখণ্ড পৃ:৩৫২

২২। অলোকে-দ্রনাথ ঠাকুর - সাক্ষাৎকার -১৮.৬.৬৮ '' আমার স্পষ্ট মনে আছে, আমরা তখন এলাহাবাদে ১৯০৯ সাল, বাবা প্রতিদিন , সন্ধ্যাবেলা একটি ক' রে গল্প পড়ে শোনাতেন।

ওঠার যুগ — আত্ম আবিষ্কারের সাধনায় আমরা নিক্ষিপ্ত হচ্ছি প্রাচীন সাহিত্য ইতিহাস, দর্শন, শিল্পকলার রাজ্যে। অতীতের গৌরবকে পুনঃ প্রতিষ্ঠার সাধনায় নুতন আলোকের সন্ধানে আমাদের দৃষ্টি তীব্র। এই বীরাচারী যুগ অবনীন্দ্রনাথকে প্রলুব্ধকরেছে মোগল - রাজপুত কাংড়া শিল্পশৈলীর অনুশীলনে এবং প্রাচীন শিল্পশাস্ত্রের ব্যাখ্যায়। এই চিত্রকলার অনুশীলন পথেই তিনি এসে পৌচেছেন রাজপুত, ইতিহাসের কাহিনী' রাজকাহিনী' তে।-

টডের অ্যানালস এণ্ড অ্যান্টিকুইট্রিজ অব রাজস্থান' 'প্রকাশিত হয় (১৮২৯ —৩২ খৃঃ)। অবনীন্দ্রনাথ টডের এই রাজস্থানের ইতিহাস থেকে যেমন প্রেরণা লাভ করেছিলেন তেমনি রবীন্দ্রনাথও ছিলেন তাঁর মর্ম্মমূলে। রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িক কালে রচনা করেছেন — কথা (১৯০০) কাহিনী (১৯০০) কল্পনা (১৯০০)। 'কথার' কবিতা গুলিকে তিনি' ন্যারে - টিভ শ্রেণীতে 'গণ্য' করেছেন এবং বলেছেন যে তারা চিত্রশালা, তাদের মধ্যে কোন গল্পের শিকল গাঁথা নেই, তারা এক একটি খণ্ড খণ্ড দৃশ্য। যেহেতু' 'ছবির অভিমুখিতা বাইরের দিকে অনাবিল দৃষ্টিতে স্পষ্ট রেখায় সেইজন্যে মনের মধ্যে এই ছবির প্রবর্ত্তনা এমন বিষয় বস্তুকে স্বভাবতঃ বেছে নেয় যার ভিত্তি বাস্তবে।[২৩] এরই সন্ধানে তিনি গিয়েছিলেন ইতিহাসের রাজ্যে। এই সময়কার কাব্যে এমন একটা মহল তৈরী হয়েছে, যার দৃশ্য জেগেছে ছবিতে যার রস নেমেছে কাহিনীতে যাতে রূপের আভাস দিয়েছে নাটকীয়তা। অবনীন্দ্রনাথের ও মনের মধ্যেকার এই ছবির প্রবর্ত্তনা বাণীরূপ পেয়েছে' রাজকাহিনীর' কথাবস্তুতে। রাজকাহিনী

২৩। রবীন্দ্রনাথ।—'কথা' কাব্যের সূচনা - শতবর্ষ সং ১মখণ্ড পৃঃ ৬০৭

মনোরম বর্ণানুলেপনে দৃশ্য হ'তে দৃশ্যান্তরে পদক্ষেপ' 'কাকচক্ষু জলের মতো নির্ম্মল সেই আয়নার ভিতর পদ্মিনীর রূপের ছটা, হাজার হাজার বাতির আলো যেন আলোময় করে প্রকাশ ~~চোখ~~ হলো বাদশা দেখতে লাগলেন, সে কি কালো চোখ ! সে কি সুটানা ভুরু । পদ্মের মৃণালের মতো কেমন কোমল দুখানি হাত । বাঁকা মল পরা কি সুন্দর ছোট দুখানি রাঙা পা । বাদামী রঙের পেশোয়াজে মুক্তোর ফুল , গোলাপী ওড়নায় সোনার পাড় , পান্নার চুড়ি , নীলার আংটি হীরের চিহ্ন ।[২৪] বাদশা আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন — একি মানুষ না পরী ,— আর একটি দৃশ্য — সোনা মাখানো মেঘের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে দুটি পাখী ছোট বড়' দু জনের জক ব'য়ে , সূর্যের আভা আকাশ রাঙিয়ে তাদের দু জোড়া ডানার পালকে এসে ঠেকেছে শাদা পালের হাওয়ার মতো । চিতোরের কেল্লায় বন্দী অসহায় মকুল আর তার মায়ের ডাক সকালের সোনায় মাখা, দুপুরের রোদে পোড়া, সন্ধ্যার মেঘ আর আলোর চিত্রবিচিত্র দিনের মধ্যে দিয়ে রাত্রির নীল-গোলা অন্ধকার আকাশ পার হ'য়ে যেদিন মান্ডুর কেল্লায় চন্ডের কাছে এসে পৌঁছল সেদিন চন্ড সব দুঃখ , সব অপমান ভুলে অনেকদিনের কোনে রাখা তলোয়ার আর একবার কোমরে বেঁধে উঠে দাঁড়ালো ।"[২৫]

(চন্ড)

কিংবা —' পুষ্পবতী যত্ন করে নিজের কালো চুলের চেয়ে মিহি , আগুনের চেয়ে উজ্জ্বল একগাছি সোনার তার সরু হতেও সরু একটি সোনার ছুঁচ পরিয়ে একটি ফোঁড় দিয়েছেন মাত্র , আর চাঁপার কলির মতো পুষ্পবতীর কচি আঙুলে সেই সোনার ছুঁচ বোলতার হুলের

---

২৪ [illegible]। অবনীন্দ্রনাথ — রাজকাহিনী - ১৪ শ সং পৃঃ ৭৭

২৫। .. .. ১৪ শ সিগনেট সং পৃ : ১৫৮

মতো বিঁধে গেল। যন্ত্রনায় পুষ্পবতীর চোখে জল এল, তিনি চেয়ে দেখলেন, একটি ফোঁটা রক্ত জ্যোৎস্নার মতো পরিষ্কার সেই রূপোর চাদরে রাঙা এক টুকরো মনির মতো ঝক ঝক করছে। পুষ্পবতী তাড়াতাড়ি নির্মল জলে সেই রক্তের দাগ ধুয়ে ফেলেতে চেষ্টা করলেন; জলের ছিটে পেয়ে সেই একবিন্দু রক্ত ক্রমশঃ ক্রমশঃ বড় হয়ে, একটুখানি ফুলের গন্ধ যেমন সমস্ত হাওয়াকে গন্ধময় করে, তেমনি পাতলা ফুর ফুরে চাদর খানি রক্তময় করে ফেললে।[২৬]

(শিলাদিত্য)

তবে এক্ষেত্রে যথাসম্ভব তিনি ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন এবং দৃশ্যগুলিকে একটি সুসংবদ্ধ কাহিনীতে সাজিয়েছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রাজপুত ইতিহাস অবলম্বিত নাটকের দৃশ্যগুলি এর অন্যতম অনুপ্রেরণা তাই রাজকাহিনীর রক্তাক্ত সংগ্রামের রক্ত পিচ্ছিল পথে বহির্দ্বন্দ্ব আর অন্তর্দ্বন্দ্বের ছায়াপাতে নাটকীয়তার আভাস।

যেহেতু অবনীন্দ্রনাথ মনোধর্মে রবীন্দ্রনাথের অনুবর্তী তাই বীররসের গদ্যকাব্য রচনায় অস্ত্রের ঝনৎকারের মধ্যে এনেছেন গীতিকাব্যের সুরমূর্ছনা। শিলাদিত্যের দিগ্বিজয় অভিব্যক্ত হয় গায়েবীর আর্তসুরে, একলিঙ্গের দেওয়ান বীরমূর্তি বাপ্পাদিত্য শত রাজকার্যের মধ্যেও স্মরণ করেন সেই শোলাঙ্কি রাজকুমারীকে'' যখন নিস্তব্ধ যুদ্ধক্ষেত্র কোনদিন পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় আলোময় হয়ে যেত, তখন বাপ্পার সেই ঝুলন পূর্ণিমার রাত্রে চাঁপাগাছের ঝুলনায় শোলাঙ্কি রাজকুমারীর হাসিমুখ মনে পড়ত; যখন কোনো নতুন দেশ জয় করে বাপ্পা সেখানকার নতুন রাজপ্রাসাদে সোনার পালঙ্কে নহবতের

২৬। অবনীন্দ্রনাথ' রাজকাহিনী' ১৪ শ সিগনেট সং - পৃ: ২১

মধুর সুর শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তেন, তখন সেই পূর্ণিমার রাতে চাঁপাগাছের চারিদিকে ঘিরে ঘিরে রাজকুমারীর সখীদের সেই ঝুলন গান স্বপ্নের সঙ্গে বাপ্পার প্রাণে ভেসে আসত। [২৭] (বাপ্পাদিত্য)। রানা চণ্ডের দাপটে সারা রাজস্থান কম্পিত কিন্তু নিস্তব্ধ রাত্রে অজানা ব্যথায় ভেঙে যায় চণ্ডের বীর হৃদয় - ''অন্ধকারের মধ্যে একলাটি চুপ করে পড়ে রয়েছেন। চণ্ডের দেহমন সমস্ত অসাড় হয়ে মরে গেছে, কেবল তাঁর চোখ যেন জীবনের সব আলো - টুকু টেনে নিয়ে প্রহরেরপর প্রহর বর্ষারাতের অন্ধকারে কি যেন সন্ধান করে ফিরছে। - - - - - - - - - - তারপরে মেঘ আস্তে আস্তে পাতলা হয়ে এ'ল, রাত্রি শেষের সঙ্গে রূপোর মত শাদা আলো ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে এসে অন্ধকারকে ক্রমে ফিকে করে, ভোরের একটি ছোটো পাখির গানের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই ফুটে উঠতে লাগল, ঠিক সেই সময় বাদলা দিনের সকাল বেলার ফুটন্ত কচি আলোর মাঝে একখানি জলভরা মেঘ। চণ্ড দেখছেন, সে কি বা চোখ জুড়ানো শান্তরূপ যেন তাঁর মা, চণ্ড সেই মেঘের দিক থেকে আর চোখ ফেরাতে পারছেন না, সারারাত্রি অন্ধকারের মধ্যে তাঁর দুই চোখ যে এরই সন্ধানে তাঁর মরা মায়ের সন্ধানে ফিরছিল, এতক্ষণে দেখা পেলেন, তাঁর বুকের বেদনা টানা তার ছেড়ে দিলে যেমন, তেমনি কাঁপতে কাঁপতে একেবারে শান্ত হয়ে গেল[২৮]।' (চণ্ড)

তাই রাজকাহিনী বীররসের সঙ্কলন হ'লেও এর ভাষায় ওজঃগুনের চেয়ে স্নিগ্ধতা বেশী। অবনীন্দ্রনাথ যেমন রাজপুত চিত্রশৈলীর চড়ারঙের উজ্জ্বলতাকে মিলিয়ে দিয়েছেন 'ধোওয়াট' পদ্ধতির কোমল রঙের কমনীয়তায়, তেমনি রাজকাহিনী ইতিকথার বাস্তব

২৭। অবনীন্দ্রনাথ — রাজকাহিনী - (১৪শ সিগনেট সং) - পৃঃ - ৫৯

২৮। অবনীন্দ্রনাথ — রাজকাহিনী (চতুর্দ্দশ একত্রিত সিগনেট সং) পৃঃ ১৪২

তথ্যকে রোমান্সের মায়াঞ্জন বুলিয়ে রূপান্তরিত করেছে অধুনাযুগের রূপকথায় ।

উনিশ শতকের শেষ দশকে অবনীন্দ্রনাথের যখন সৃষ্টিপর্য্যায়ের শুরু রবীন্দ্রনাথ তখন লব্ধ প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক । মানসী , সোনারতরী , চিত্রা চৈতালী - নৈবেদ্যের কবিকে বাংলাদেশ স্বীকার করে নিয়েছে । রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছেন তাঁরা কেউই তাঁর প্রভাবমুক্ত থাকতে পারেন নি । আগেই দেখেছি অবনীন্দ্রনাথের ভাবপ্রেরণার উৎসমূলে দাঁড়িয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ কখনো প্রত্যক্ষে কখনো পরোক্ষে । রবীন্দ্র কাব্যে সীমা অসীমের দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে মানসী পর্ব্বেই , চিত্রায় এসে কবিজীবনে একদিকে অসীম দিগন্তে নিরুদ্দেশ যাত্রা — ''আর' যতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী' - , আর একদিকে মানব কোলাহল পূর্ণ সংসার জীবনে প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষা - এবার ফিরাও মোরে'' রবীন্দ্রকাব্যে বারে বারে দেখা দিয়েছে এই দ্বিধা , এই সংশয়, এই সংশয়ের বেদনা । শেষ পর্যন্ত অধ্যাত্ম অনুভূতির গভীরতায় পরম প্রশান্তিতে নির্ব্বাণলাভ করেছে রবীন্দ্রকাব্য । অবনীন্দ্রনাথের প্রথম সৃষ্টির যুগে এই সীমা অসীমের ভাবধারা কাহিনী প্রবন্ধ নাটক সবকিছুতেই পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করেছে। ''ধর্ম্মের দিক দিয়ে, আর্টের দিক দিয়ে, সকল কর্ম্মের দিক দিয়ে , পূর্ণিমার ব্রত পালন এই ভাবে করে চলেছে সাধক মানুষ - অপরিপূর্ণতার আসনে বসে পরিপূর্ণের পূজা -'' - - - - - - - - - বিচিত্রকে রাগ, দুইকে নিয়ে বন্ধন , সাতকে নিয়ে সুর সার — খণ্ডকে নিয়ে অখণ্ডের লীলা ।[২৬] রবীন্দ্রনাথ যেখানে মিস্টিকের গভীরতায় অবগাহন করেছেন - অবনীন্দ্রনাথ সেখানে

২৬। অবনীন্দ্রনাথ — পূর্ণিমার ব্রত - ভারতী ১৩৩০ , পৌষ পৃঃ ৭৮৭

কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হন নি। তবে ঘরছাড়া মুক্ত জীবনের উধাও করা আকুল আহ্বানের মাঝে অনিবার্য আকর্ষণের বশে ফিরে এসেছেন গৃহনীড়ের শান্তিতে। ঘরের কোনের সামান্য বস্তুতে এনে দিতে চেয়েছেন অসীমের ব্যঞ্জনা।

অবনীন্দ্রনাথের নালক (১৯১৫), বুড়ো আংলা (১৯২১), আলোর ফুলকি (১৯২০) আলোচনা করলে ঐ সত্যই অবনীন্দ্র প্রদর্শিত সৃষ্টিপথ অনুসরণে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে।

কিশোর নালক অনন্ত সৌন্দর্য্য, অপার আনন্দের আধার বুদ্ধদেবের দর্শন আকাঙ্ক্ষায় দেবল ঋষির সঙ্গে ঘর ছাড়ে। তারপর কেটে যায় দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর, ইতিমধ্যে ধ্যান চক্ষে সে দেখে এবং বলে যায় বুদ্ধ দেবের জন্ম, শৈশব, বিবাহ, গৃহত্যাগ সাধনা ও সাধনায় সিদ্ধিলাভ। কুণ্ডলীকৃত পটচিত্রের মতই অবনীন্দ্রনাথ মেলে ধরেছেন বুদ্ধদেবের জীবনকথা — বুদ্ধের জন্ম হ'ল — ''পূবে পূর্ণিমার একটি সোনার ছাতা., ঠিক সেই সময় বুদ্ধদেব জন্ম নিলেন — যেন একটি সোনার পুতুল চাঁপাফুলে ঘেরা পৃথিবীতে যেন আর এক চাঁদ।[১৭] তারপর নালকের চোখের সামনে ছবি আসছে —''রাজা শুদ্ধোদন বুদ্ধদেবকে কোলে নিয়ে হরিণের ছালঢাকা গজদন্তের সিংহাসনে বসেছেন, রাজার দুইপাশে চার চার গণৎকার, রাজার ঠিক সামনে হোমের আগুন, ওদিকে গোতমী মা, তাঁর চারিদিকে ধানদূর্ব্বা, শাঁখ ঘন্টা, ফুল চন্দন, ধূপধুনো।''[১৮] তারপরে সিদ্ধার্থের বিবাহ,

---

১৭। অবনীন্দ্রনাথ — নালক — ৫ম সিগনেট সং পৃঃ ১২
১৮। ,, ,, ৫ম ,, পৃঃ ১৮

রোগ শোক, জরার দৃশ্য — তপস্যা, সুজাতার পায়েস প্রদান, সাধনায় সিদ্ধিলাভ সবই এক একটি নিখুঁত চিত্র। পরে যখন বালকের ধ্যান ভাঙে তখন বুদ্ধদেব আসছেন বালকের বাসস্থানের নিকটেই, বালক জানে না বুদ্ধদেবের আগমন বার্তা; এদিকে ভরা বর্ষায় বালকের মন টানে সেই — তেঁতুল গাছের ছাওয়ায় মাটির ঘরে তার মায়ের কাছে অথচ বুদ্ধদেবকে দেখার সাধটুকুও সে ছাড়তে চাইছে না। একদিকে অনন্ত জীবন, অনন্ত সৌন্দর্য, অনন্ত মুক্তির জীবনবাণী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন বুদ্ধদেব আর একদিকে মায়ের স্নেহঘেরা বাৎসল্য ভরা অন্তরের অনিবার্য্য আকর্ষণ। সে ফিরে আসে মায়ের কাছে, যখন ডাক আসবে তখন চলে যাবার সঙ্কল্প নিয়ে। ''আবার সেদিন কবে আসবে, যেদিন বুদ্ধদেব এই দেশে এসে ঘাটের ধারে আটকা পড়া ফুলটির মতো তাকে তুলে নিয়ে আনন্দের মাঝগঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে যাবেন।"[৩২] ঘর ছাড়া আর ঘরে ফেরা এই দুই এর আকর্ষণে দোলায়িত চিত্ত বালক রবীন্দ্রনাথের ভাবপ্রেরণায় উদ্ভাসিত অবনীন্দ্রনাথের নবীন সৃষ্টি।

গণেশের শাপে ছোটছেলে 'রিদয়' পরিণত হয় এক আঙুল প্রমাণ বুড়ো আংলা যক্ষকে। তারপর সুবচনীর খোঁড়া হাঁসের পিঠে চড়ে তার উত্তর প্রয়াণের রূপকথা। নিঃসীম আকাশে ভেসে চলে হাঁসের দল — কত গ্রাম, কত মাঠ — কত জনপদ - কত প্রান্তর পার হ'য়ে পথে আসে বিপদ - আসে বিপদ মুক্তির জয়োল্লাস। কত দেখা না দেখা জগতের আকর্ষণে - 'রিদয়' ভুলে যায় ঘরের কথা, মায়ের কথা। মুক্তির আনন্দে উধাও করা মন চলে যেতে চায় নিরুদ্দেশ লোকে কিন্তু পাখীর দল যখন ঘরে ফেরার আকাঙ্ক্ষায় চঞ্চল হ'য়ে ডাক দিতে দিতে ফিরে চলে, তখন ফেলে আসা ঘরের জন্যে বেদনা মথিত হয়

'ছোট হৃদয়ের' ছোট মন' -- সারাদিন ধরে আজ তার কেবলি মনে পড়তে লাগল আমতলির সেই ঘর ক'খানি, সেই তেঁতুলতলার ঘাট, তেপান্তর মাঠ, হাঁসপুকুরের কাদাজল, তাতে শালুক ফুল, বাড়ির ধারে ঝুমকো লতার মাচাতার উপরে দুগগা টুনটুনি পাখিটি, উঠোনের কোণে তুলসী মঞ্চটি, ---- সব আজ পরিষ্কার যেন 'বিদায় চোখে দেখতে লাগল :, আর থেকে থেকে মন তার ঘরে যেতে আকুলি বিকুলি করতে থাকল।[৩৬]

আলোর ফুলকির প্রেমতত্ত্বও তাই — সীমার মধ্যে সে আনে দূর বনের অজানা জগতের বাণী। নায়ক কুঁকড়োর ঘরে চার গিন্নী থাকতেও বুকের মাঝে তার ফাঁকা, কাব্য বিদায় নিয়েছে জীবন থেকে। অকস্মাৎ কোন স্বপ্নরাজ্যের বার্তা নিয়ে উড়ে আসে সোনালী বনমুরগী — আরম্ভ হয় কুঁকড়োর প্রবল প্রেমের সঙ্গে অবুঝ আবদারের দ্বন্দ্ব। পাওয়া - না - পাওয়ার দোলা লাগে আকাশে বাতাসে, সুগভীর আনন্দের সঙ্গে আসে মর্মান্তিক দুঃখ। তারপর ভুল ভাঙে সোনালী বনমুরগী মুক্তজীবনের অঙ্গন থেকে বন্দী হয় কর্তব্যের সংসারে; প্রেম আর কর্তব্যের মেলবন্ধনে আসে শান্তির বার্তা।

রোম্যান্টিকের ধর্মই সামান্যকে অসামান্য রূপে প্রতীয়মান করা; চিরপরিচিত কে চির অচেনার রূপে প্রতীত করা; এই সৌন্দর্যদ্রষ্টা তথা সৌন্দর্য আবিষ্কর্তার বিস্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টি কুঁকড়োর চোখে — কুঁকড়োর নায়িকা সোনালিয়া বলে -- -''আকাশ দিয়ে যখন পাখিরা উড়ে চলে তখন তোমার মন নতুন দেশ বড়ো পৃথিবীটা দেখবার জন্যে একটুও আনচান করে না?''

৩৬। অবনীন্দ্রনাথ — "বুড়ো আংলা" - (৩য় সিগনেট সং) — পৃ:-১৭৬

২১। অবনীন্দ্রনাথ — আলোর ফুলকি - বিশ্বভারতী সং — পৃ :২৩

— বুকড়ো বললেন , — একটুও নয় । পৃথিবীতে একঘেঁয়ে দিনও নেই, পুরানোও কিছু হয় না । আমি এতটুকু জায়গাকেই প্রতিদিন নতুন নতুন ভাবে দেখতে পাই ।[৩৪] — এই ভাবেরই প্রতিচ্ছায়া 'দেখেছি রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রে । —''তখন মনে হয় - আমার সেই পদ্মাতীর হয়তো পুরোনো হয়ে গেছে -- কিন্তু আশ্চর্য এই, যেই এখানে পা ফেলি অমনি দেখতে পাই সবই সেই প্রথম শুভদৃষ্টির সময়টির মতো উজ্জ্বল বিস্ময় পূর্ণ হয়ে আছে ।''[৩৫]

নালক, বুড়ো আলা , আলোর ফুলকির কাহিনী অবনীন্দ্রনাথের স্বকপোল কল্পিত নয় । অবনীন্দ্রনাথ 'নালক' রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন এডুইন আর্নল্ডের লাইট অব এশিয়া' গ্রন্থ থেকে । আর্নল্ড এর গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ বোধকরি ১৮৭৯ খৃ : । পরে এটির বহু সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে । লণ্ডন থেকে' "Some phases in the life of Buddha", '(১৯১৫) নামে এটি নাটকাকারেও - প্রকাশিত হয় ।[৩৬] আর্নল্ড একদা এর ভূমিকায় বলেছিলেন'' "I have put my poem into a Buddhist's mouth, because to appreciate the spirit of asiatic thoughts they should be regarded from the oriental point of view".[৩৭]

[৩৮] অবনীন্দ্রনাথ শুধু এই রীতিটুকু গ্রহণ করেছেন মাত্র । আক্ষরিক অনুবাদ বা ভাবানুবাদ কিছুই করেননি । ঘটনার দিক থেকে সাদৃশ্য থাকলেও অবনীন্দ্র নাথের চিত্রকল্প রঙে রূপে আরও উজ্জ্বল আরও স্পষ্ট -- "Queen Maya stood at noon, her days fulfilled,

পাদটীকা – ৩৪/৩৫/৩৬/৩৭ - পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য,

under a Palasa in the palace grounds. A stately trunk, straight as a temple shaft, with crown of flossy leaves and fragrant blooms;" [৩৮]

৩৯

অবনীন্দ্রনাথ

বুদ্ধজন্মের এই পূর্ব্ব মুহূর্ত্তটি বর্ণনা করছেন - -''রাত আসছে । বসন্ত কালের পূর্ণিমার রাত । পশ্চিমে সূর্য ডুবছেন , পুবে চাঁদ উঠি উঠি করছেন । পৃথিবীর এক পারে সোনার শিখা , আর একপারে রূপোর রেখা দেখা যাচ্ছে । মাথার উপর নীল আকাশ , লক্ষকোটি তারায় আর সন্ধিপুজোর শাঁখ ঘন্টার ভরে উঠছে । এমন সময় মায়াদেবী রূপোর জালে ঘেরা সোনার পালকিতে সহচরী সঙ্গে বাগানে বেড়াতে এলেন, রাণীকে ঘিরে রাজদাসী যত ফুলের পাখা পানের বাটা নিয়ে । প্রিয় সখীর হাতে হাত রেখে, ছায়ায় ছায়ায় চলে ফিরে , রাণী এসে বাগানের মাঝে প্রকাণ্ড সেই শালগাছের

৩৪। অবনীন্দ্রনাথ - আলোর ফুলকি - বিশ্বভারতী সং পৃ: ২৩

৩৫। রবীন্দ্রনাথ - ছিন্নপত্রাবলী - পত্রসংখ্যা - ২০০ শতবর্ণ সং ১১শখণ্ড -

৩৬। Arange by Valerie Wyngate - 'Some phases in the life of Buddha" (The light of Asia dramatised) 1915

- Sir Edwin Arnold - Light of Asia (1921) Preface.

৩৭। Do -DO- Page - 3

৩৮।

তলায় দাঁড়ালেন -- বাঁহাত খানি ফুলে ফুলে ভরা শালগাছের ডালে, আর ডান হাতখানি কোমরে রেখে ।''[৩৯]

নাইট অব এশিয়ার' সঙ্গে প্রধান পার্থক্য হচ্ছে 'নালক' চরিত্র সৃষ্টিতে । আর্নল্ডের গ্রন্থে এই ধরনের' কোন কিশোর চরিত্রের স্থান নেই, কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের 'নালক' রবীন্দ্র মনোধর্ম্মের সঙ্গে সহধর্ম্মিতা লাভ করে সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি -- নালক বন্ধনহীন মুক্তির আনন্দে বিশ্বাসী --সে তাই ভাবে' 'আহা ওদের মত যদি ডানা পেতাম তবে কি আর মা আমাকে ঘরে বন্ধ করে রাখতে পারতেন ? এক দৌড়ে বনে চলে যেতাম । --- নালক মনে মনে ভাবে আজ যদি এমন একটা ঝড় ওঠে যে আমাদের গ্রামখানা ঐ পাঠশালার খোড়ো চালটা শুদ্ধ ভেঙেচুরে উড়িয়ে নিয়ে যায়, তবে বনে গিয়ে আমাদের থাকতেই হয়, তখন আর আমাকে ঘরে বন্ধ করবার উপায় থাকে না ।''[৪০]

সুইডিশ লেখিকা সেলমা লাগেরলফের অ্যাডভেঞ্চারস্ অব নাইলস্' 'The Wonderful adventures of Nils / 'The further adventure of Nils' এই দুটি খন্ডে প্রকাশিত হয় ১৯০৬ -- ৭ খৃঃ । - অবনীন্দ্র নাথের' বুড়ো আংলা' এই কাহিনীর ছায়া অবলম্বনে রচিত ।

৩৯, ৩৯। অবনীন্দ্রনাথ - নালক - ৫ম সিগনেট সং - পৃঃ ১২

৪০ ৪০। ,, ,, ,, পৃঃ ১৪ -- ১৫

অবনীন্দ্রনাথ প্রথম খণ্ডের মূল ঘটনাগুলি মাত্র গ্রহণ করেছেন। লাগেরলফের' নাইলস' দীর্ঘ বার বছর পরে আবার মানুষের রূপে ঘরে ফিরে এসেছে, তার স্বভাবের ও পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু মন তার বাঁধা পড়ে গেছে সেই হাঁসের দলের কাছে যারা ছিল তার দীর্ঘ বার বছরের নানা সুখ দুঃখ আনন্দ বিষাদের সঙ্গী। তাই লাগেরলফের গ্রন্থশেষে একটি অস্ফুট দীর্ঘশ্বাস'' " Nils felt such a yearning for his departing comrades that he almost wished he were Yummetott again and could travel over land and see with a flock of wild geese". [৪১]

কিন্তু

অবনীন্দ্র নাথের' বুড়ো আলা' হৃদয় এত দীর্ঘকালের জন্যে গৃহত্যাগ করেনি, তার অভি - যান যে লেখক স্বপ্ন কল্পনা হিসাবে দেখিয়েছেন, গ্রন্থের শেষে তার স্বপ্ন থেকে জাগরণ এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতার সূত্রে স্বভাবেরও পরিবর্তন দেখানো হয়েছে।' বুড়ো আলা রিদয় আবার রিদয়' হয়েই দেখা দিয়েছে' 'রিদয়ের মা চেঁচিয়ে বললে —'' এত বড়টি হলি তবু তোর ছেলেমানুষি গেল না। উঠে আয়, পাঠশালায় যা।'' [৪২]

'বুড়ো আলা' যে সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি হতে পেরেছে তার কারণ অবনীন্দ্রনাথ এটিকে

৪১। Selma Lagerof - The Further Adventures of Nils (1957) Page - 246.

৪২। অবনীন্দ্রনাথ - বুড়ো আলা - ৩য় সং পৃ: ১৮৯

সম্পূর্ণভাবে বিদেশী প্রভাব মুক্ত করতে পেরেছেন । প্রকৃতি বর্ণনায় কোথাও লাগেরলকের গ্রন্থের প্রভাব দেখা যায় না । সুইডেনের গ্রীষ্ম প্রকৃতি লেখিকার বর্ণনায় - মূর্ত হয়ে উঠেছে - - "It was the most beautiful weather outside. It was only the twentieth of March; but the boy lived in West - Vemmenhog parish, down in Southern Skane, where the spring was already in full swing. It was not as yet green, but it was fresh and budding. There was water in all the ditches and colt's foot on the edge was in bloom. All the weeds that grew in among stones were brown and shiny. The beech woods in the distance seemed to swell and grow thicker with every second. The sky was high and a clear blue." [৪৬]

তার

অবনীন্দ্রনাথ' এঁকেছেন পল্লীবাংলার গ্রীষ্মপ্রকৃতির নিখুঁত ছবি — "তখন শীত গিয়ে গরম পড়তে আরম্ভ হয়েছে । গাছে গাছে আমের বোল আর কাঁচা আমের গুটি ধরেছে, পানা - পুকুরের চারধার আমরুলী শাকের সবুজ পাতায় ছেয়ে গিয়েছে , আলের ধারে ধারে নতুন দুর্বো , আকন্দফুল সবে দেখা দিয়েছে ; দূরে শাল পিয়ালের তেঁতুল তমালের বনে নতুন পাতা

৪০। Selma Lagerlöf – 'The adventures of Nils – (1956) – Page-4.

~~৪৩। অবনীন্দ্রনাথ - বুড়ো আংলা - ৩য় সং - পৃঃ ৬~~

লেগেছে , আর দেখতে দেখতে সমস্ত বন যেন পুরুত বাড়ীত হয়ে উঠছে , রোদ পাতায় পাতায় কাঁচা সোনার রঙ ধরিয়ে দিয়েছে, কুয়াশা আর মেঘ সরে গিয়ে মনে হচ্ছে যেন নীল আকাশের কপাট হঠাৎ খুলে গেছে আর আলো আর বাতাস ছুটে বেরিয়ে এসেছে — বাইরে ।[88] এই পল্লীচিত্রের সমপর্যায়ী ছবি আমরা পাই গল্পগুচ্ছের পাতায় আর ছিন্নপত্রের পত্রাবলীতে ।-

লাগেরলফের 'Nils' এর তুলনায়'রিদয়' অনেক বেশী'ঘরোয়া । এই চারিত্রিক পরি - বর্তনের মাপকাঠিতে , বুড়ো আংলা' তাই বিদেশী বই এর অনুবাদ মাত্র নয়, অবনীন্দ্র মনোধর্ম্মের সাযুজ্য লাভে নূতন সৃষ্টি । Nils যখন বুনো হাঁসের দলের সঙ্গী হয় - তখন বাড়ীর জন্যে তার মন আর কাঁদে না - "Therefore there was no one whom he missed or longed for". ..... "No, said the boy, that's nothing to regret, I have never been as well off as here with you".[৪৫]

[৪৬] আর বুড়ো আংলা' রিদয়ের মন কাঁদে ঘরের নিবিড় ভালবাসা আর স্নেহভরা আবহাওয়ার জন্যে — ''শীতের রাতে আগুন জ্বালা ঘরখানি — এই ছেলের দল, এই হাসিখুশি গল্প দেখে রিদয়ের চোখে জল আসতে - লাগল । তারও ঘর আছে তারও দাদা আছে, দিদি আছে, অথচ সব থেকেও নেই ।কোথায় রইল তাদের আমতলি , কোথায় সেই মাটির দেওয়াল দেওয়া ঘরগুলি । - - - - - - - - বুড়ো আংলা বাইরে শীতে বসে অঝোরে কাঁদতে লাগল ।''[৪৬]

৪৪। অবনীন্দ্রনাথ - বুড়ো আংলা - ৩য় সং পৃঃ৬
৪৫। Selma Lagerlöf — 'The Adventures of Nils. (1956)- Page= 73.
৪৬। অবনীন্দ্র নাথ - বুড়ো আংলা ৩য় সং পৃ : ৮২ -৮৩

এই বুড়ো আলো' বালার ছেলে , অনেক বেশী স্পর্শকাতর , আবেগপ্রবণ অনেক বেশী পরিচিত ।

"Florence Yeats Hann" - Edmond Rostand রচিত

"The Story of Chanticleer (1913) গ্রন্থের অনুবাদ করেন । অবনীন্দ্রনাথের 'আলোর ফুলকির' প্রত্যক্ষ প্রেরণা হানের গ্রন্থ । রোস্তাদের Chanticleer শিল্পীর সত্তা বহনে সমৃদ্ধ - সে বলে - - " All things cry towards light, towards beauty and health, wanting to live, and sing, to work, and be glad in the sunshine ! Chanticleer paused. " And when all these cries reach me", he went on slowly, I try to make myself great, that I may hold them all, and for one moment I keep them back again to strength and then my song bursts out, so clear, so strong and proud that, that the horizon is seized with a rosy trembling and obeys me." ৪৭

অবনীন্দ্রনাথের আলোর ফুলকিও তাঁর শিল্পী সত্তার বাণী বহন করে নবীন জন্ম লাভ করেছে এবং শিল্পী মানস রবীন্দ্র মনোধর্মের সহযোগে দৃঢ় ভিত্তিক । রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য সমস্যা ও সৌন্দর্য তত্ত্ব নিয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন , অবনীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব পথ বেয়ে উপনীত হয়েছিলেন সেই একই লক্ষ্যে - রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যের পথে গ্রন্থে

~~[illegible] এই লক্ষ্যে - রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যের পথে গ্রন্থে~~

৪৭। Edmond Rostand — 'The story of Chanticleer" -(1913)- Page-62

বললেন - -

'' মানুষ তাই মধুর করেই বললে, আমার হৃদয়ের তারে তোমার নিমন্ত্রণ বাজল, রূপে বাজল, ভাবনায় বাজল, কর্মে বাজল, হে চিরসুন্দর আমি স্বীকার করে নিলেম আমিও তেমনি সুন্দর করে তোমায় চিঠি পাঠাব যেমন করে তুমি পাঠালে। '' ৪৮ (সৃষ্টি ১৩৩১)

অবনীন্দ্রনাথ বললেন - -

''স্রষ্টা যা সৃষ্টি কর্তার ঋণী হয়ে বসে রইলো না, এইখানেই সেরা শিল্পীর গুণপণা মহাশিল্পের মহিমা প্রকাশ পেলে, - - - পাতার ঘরের এতটুকু পাখী সকালসন্ধ্যা আলোর দিকে চেয়ে সেও বল্লে, আলো পেলেম তোমার সুর নাও আমার, নতুন নতুন আলোর ফুলকি দিকে দিকে সকলে যুগ যুগান্তর আগে এই কথা বলে চল্লো, তারপর একদিন মানুষ এলো। '' ৪৯ (শিল্পের অধিকার, ১৩২৮) শিল্পী সত্তার এই সাড়া দেওয়ার কথা - আরও আগে ধ্বনিত হয়েছে আলোর ফুলকির নায়কের সংলাপে -'' এই জগৎসুদ্ধ সবার কান্না আলোর প্রার্থনা এক হয়ে যখন আমার কাছে আসে তখন আমি আর ছোটপাখিটি থাকিনে বুক আমার বেড়ে যায়, সেখানে প্রকাণ্ড আলোর বাজনা বাজছে শুনি, আমার - দুই পাঁজর কাঁপিয়ে তারপর আমার গান ফোটে'' আলোর ফুল।'' আর তাই শুনে পুবের আকাশ গোলাপী কুঁড়িতে ভরে উঠতে থাকে। ৫০

মেয়েলি ছড়া ও ব্রতকথার সংগ্রহে ও সৌন্দর্য বিশ্লেষণে আদিকর্মিক - রবীন্দ্র নাথ। ১৩০১ সালে ছিন্নপত্রের যুগ থেকেই তিনি লিখেছেন' লোকসাহিত্যের ছেলেভুলোনো ছড়া', অবনীন্দ্রনাথ তাঁরই পথ অনুসরণ করেছিলেন এবং তাঁর রূপশিল্পী মন

পাদটীকা - ৪৮/৪৯/৫০ পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

এই পথে নব নব সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ ও প্রদর্শন করে চলেছিল।'' ১৯১১ সালে অবনীন্দ্র-নাথ একবার পুরী গিয়েছিলেন - সেই নৈশ নিরুদ্দেশ যাত্রার স্মৃতি সূত্র অবলম্বনে মেয়েলি আলাপ আর ছেলেমি প্রলাপ, ছড়ার বাকছন্দ ও রূপকথার রঙ মিশিয়ে অদ্ভুত কৌতুকরসের উদ্ভট্ট স্বপ্নজাগরণের, সম্ভব - অসম্ভবের, অতীত বর্ত্তমানের বহুবর্ণ বিচিত্র মায়াপট বুনলেন 'ভূতপতরীর দেশ'।[৫১] যে ছড়া আর ঘুমপাড়ানি গান ছিল লোকের মুখে ছড়ানো তাকেই ছন্দের জালে বেঁধে এক নূতন গদ্যশৈলীর সৃষ্টি করলেন অবনীন্দ্রনাথ।-

''আগে মাসির বাড়ি এসেছি পালকি চড়ে। সেখানে মোয়া খেয়ে পেট ধামা করেছি। এখন পালকিতে শুয়ে পিসির বাড়ি চলেছি। মাসি চাদরের খুঁটে খই বেঁধে দিয়েছেন —পথে জল খেতে; হাতে একগাছা ভূতপতরীর লাঠি দিয়েছেন ভূত তাড়াতে, এক লণ্ঠন দিয়েছেন আলোয় আলোয় যেতে।"[৫২] সারাজীবন যে সাহিত্যরচনা করলেন তাতে ছড়ার ছন্দ, আঙ্গিক, ছবি ও ভাষা অনুসৃত হ'ন। রবীন্দ্রনাথ ছড়ার ধর্ম্ম নির্ণয়ে বলেছেন -''আমি ছড়াকে মেঘের সহিত তুলনা করিয়াছি উভয়েই পরিবর্ত্তনশীল বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বায়ুস্রোতে যদৃচ্ছা ভাসমান। - দেখিয়া মনে হয় নিরর্থক।''[৫৩] এই ছড়ারই পরোক্ষ প্রভাব অবনীন্দ্র-নাথের যাত্রা পালায়। তাঁর যাত্রা পালা নাটক বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যাত্রা।" পুতলীর

৪৮। রবীন্দ্রনাথ - সাহিত্যের পথে - সৃষ্টি' প্রবন্ধ শতবর্ষ সং ১৪শ খণ্ড পৃঃ ৩২১ -
৪৯। অবনীন্দ্রনাথ - বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী - ১ম রূপা সং -
৫০। অবনীন্দ্রনাথ - আলোর ফুলকি - বিশ্বভারতী সং পৃঃ ৪২
৫১। সুকুমার সেন - বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় সং) ৪র্থখণ্ড পৃঃ ১৪১
৫২। অবনীন্দ্রনাথ - ভূতপরীর দেশ' (১মসিগনেট সং.) পৃঃ ৭
৫৩। রবীন্দ্রনাথ - ছেলেভুলানো ছড়া' লোকসাহিত্য - শতবার্ষিকী সং ১৩শ খণ্ড পৃঃ ৬৮১

''পুতলীর পালা'' - গণপতি সৃষ্টির বিবরণ - -

''শিব বলেন বিশ্বকর্ম্মা কাঁদিছেন পার্ব্বতী
তাঁর লাগি খেলার পুতুল গড়হ একটী ।

চিন্তান্বিত ভোলানাথ আর বিশ্বকর্ম্মা বলেন -

পুতুল গড়া কঠিন নয় -
ভয় পাছে মা জননীর মনে না ধরয় ।

তখন ডাক পড়িল ভোজরাজার - তার পুতুল গেছে উইয়ের পেটে - তখন ভোলানাথের ঝুলি হাতড়ে বেরোল সুতা - নানা গজাল তালের আঁটি — ইতিমধ্যে পার্ব্বতী গণপতি কোলে এলেন, সঙ্গে জয়া বিজয়া নন্দী ভৃঙ্গী - তখন কাটলো কাঁড়া শিব বলেন পার্ব্বতী মন্দ হয়নি গড়া । যতদেবগণ পুতলী দেখতে ছুটে এলেন ।

জয়া বিজয়ার বিবরণ - -

''স্নানের বেলা জগন্মাতা মেলে ময়দা সর
সযতনে গড়িলেন পুতর স্থূল কলেবর ।

রং চং লয়োদর দেখে সবাই তুষ্ট, শেষে এলেন শনি - জয়া - বিজয়ার উচ্চৈঃস্বরে -

প্রার্থনা - - হে মা ষষ্ঠী কাটাও রিষ্টি

ষষ্ঠী বুড়িকে নন্দী ভৃঙ্গী শুধায় -

" বলেন বুড়ি মা - কি হ'ল খবর তারপর ?

ষষ্ঠী বলেন'' পুতুল দেখে সদাশিব হইলেন সন্তুষ্ট
ক্রুদ্ধহীন করেদিল শনিচর ও দৃষ্ট ।

শেষে ষণ্ডের স্কন্ধে গজস্কন্ধ আনিয়া জুগায় — তারপরে শিব প্রাণমন্ত্র দানে জীয়ালেন পুতুলে - - মৃদঙ্গী গণেশ উঠে করেন নাচগান ।-

তারপরে খেলা দেখেন শিবপতি কৈলাসে বসিয়া পুতুল খেলা - -

১ম পুতুল	সূত্রধার
২য় ,,	চোপদার -
৩য় ,,	ভাট্ট
৪র্থ ,,	ধাই
৫ম	গোল্ডেন গুজ ,

অন্যান্য — তামুলী তামুলিনী , পরিচ্ছদবর্গ , ফরাস, তামাকখোর বুড়ো, ফেউ, পড়ুয়া রাখাল, যদুমাষ্টার , গুরু মেফাই , ছাগলী বুড়ি , ভুটিয়া ভুটিয়ানী ।-

সূত্রধার - - পুত্তলিকা পত্তনে অট্টালিকা ঘরে

চিলছত্র রাজা বসেন চিলে কোঠার পরে ।

- - - - - - - - - - - - - - - - -

গুড়িয়া বিবি বুড়িয়া ধাই

নজর বন্দী নীচের তলাটায় ।

এর মাঝে শ্যানকুত্তা

উজির নাজির পালায়ন খুট্টা ।

আছে বেমোয়ার চরেন্দা পরেন্দা

কে তার খবর করে ।'' - - - - - - -

চোপদার - - বার দেবেন গোল্ডেন গুজ সভাতলে আজ -

ভাট - - - - - স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, শৌর্য্য -বীর্য্য গাম্ভীর্য্য আকর। সংগ্রামে দুর্গম্য আর গুণের

সাগর।

চোপদার - হুজুর এসেছেন সভার মধ্যিখানে পদ শব্দ হইতেছে শুনে ল্যান কানে।

(পরিষদ সহ গোল্ডেন গুজ পুতুলের প্রবেশ)

পরিষদ - হুজুর হুজুর গোল্ড হুজুর

উজির নাজির হাজির হুজুর।

হুজুর - - - - - - খাচ্ছেন তো স্বর্ণ ডেন্ড

আমলেট চপলেট ভাজি ও ঘন্ট।-

সকলে - - - - প্রচুর প্রচুর কেলাপ কেলাপ মেলাপ হুজুর

হিয়ার হিয়ার থ্রিরি চেয়ার - - - - - - -

পারিষদ - - - আইসেন আইসেন বইসেন বইসেন

বশম্বদদের নিবেদন যিদং

কার্য্যাঙ্গে অনিবার্য্যং

গীতং বাদ্যং নৃত্যং নাট্যং

কিমধকিমিতি কিমধিকং।''

ফরাসপুতুল - দেরে তেল দেরে মন পুরোতন লণ্ঠন কটাক্ষয়

জোড়াসাঁকোর - পাঁচনম্বর বৈঠকখানায়।

(তামুলী - তামুলিনীর নৃত্যগীত)

বাম ঝমাঝম ঝামকিরি -

গানের শোভা পিটকিরি - - - - - ইত্যাদি

তামক খোর বুড়ো - হুঁকোর কেচ্ছার সঙ্গে হলদি ডোরা কাটা বাঘের কাহিনী - নাকে হুঁকোর বাড়ি পরে বাঘের নাক ভাঙলো - নাক ভাঙা বাঘ পালালো ।

(তারপর এল ফেউ) - হলদেবরণ কালো ডোরা

বাঘের আগমন বার্তা ঘোষণা করে ।

পড়ুয়া আর রাখাল চেঁচান - -

''বাঘ উঠেছেন বাঘ উঠেছেন বড় গঙ্গার ঘাটে

কার হাতেরে তেল গামছা মেওনা খিড়কী বাটে ।

(তার পর যদুমাষ্টার নেমে আসে ছেলেদের ছড়ার রাজ্য থেকে)

আই কাম বা আই কাম তাড়াতাড়ি -

যদু মাষ্টার পালাও বাড়ি

টাইগার কাম হুয়া হুম ,

পা পিছলে আলুর দম ।

গুরু বলেন - আমায় জাঁতিয়া ধর যদু ।

পড়ুয়া - (শিশুপাঠ্যের সেই মিথ্যাবাদী রাখালকে)

''কই শোনরে দুষ্ট রাখাল -
মিছে জনে না কর নাকাল ।

বাঘের আবির্ভাব এবং সেফাই এর চিৎকার - -

সামাল , সামাল, সামাল ,

শিকারীর সেরা ভুলো তিনগুলি ছুঁড়েছিল ।

(রাখাল , ছাগলী বুড়ী , যদু আর ভুটিয়া ভুটিয়ানীর কথোপকথন) - - - - - - - -

ভুটিয়া - ভুটিয়ানী - - - -

টুং সোনাডা ঘুম

রীল কুম ঝুমা ঝুম

হুমা হুম গুমা ঝুম ঘুমা ঘুম ,

একরীল , দো রীল , তিন রীল , চাহ্রীল , গ্যাংঘোষুং

ফ্রীম ফ্রুম চিনামাকি ধুম

টীকস্ মাস্টার হ্যালো হ্যালুম

হাডু - ডু - ডুম - ডুম .

টুং সোনাডা ঘুম ।

ঘুম সোনাডা টুং — '' । [৫৪ক]

এইভাবে আপাত অর্থহীন শব্দের ঝঙ্কারে - পুতলীর পালার সমাপ্তি । যাত্রা পালার মধ্যে বিচিত্র চরিত্রের আবির্ভাব এবং অসংলগ্ন বিষয়বস্তুর অবতারণা যদৃচ্ছ ভাসমান মেঘের মতই নির্ভার বস্তু ।

৫৪ক। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর - 'পুতলীর পালা' শারদীয়া বসুমতী - (১৩৬৫) (আংশিক উদ্ধৃতি দেওয়াহল

'ভূতপতরীর দেশের' কৌতুক স্রষ্টা অবনীন্দ্রনাথই 'বাংলার ব্রত' লিখলেন, লিখলেন 'ছেলে ভোলানো ছড়া' প্রবন্ধ, অক্লান্ত আগ্রহে বাংলার পুঁথি পাঁচালি, গ্রামীন শিল্প সংগ্রহে, লোকশিল্পের অঙ্কন পদ্ধতি সংগ্রহে তৎপর হলেন। যে লোকসাহিত্য অবনীন্দ্রনাথের সৃষ্টি পর্য্যায়ের অন্যতম অঙ্গ তারই প্রেরণার মূলে আছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন 'স্ফুলিঙ্গ' আর তারই ছোঁওয়ায় জ্বলে উঠে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন অর্দ্ধালোকিত অঙ্গন উদ্ভাসিত করেছে অবনীন্দ্রনাথের প্রাণপ্রদীপের শিখা।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বে একটি বিশিষ্ট মত হচ্ছে লীলাবাদ। প্রয়োজনের সাহিত্য আর অপ্রয়োজনের সাহিত্যের মধ্যে তিনি গণ্ডীরেখা টেনেছেন। তাঁর মতে কোন বিশেষ প্রয়োজনে সাহিত্য রচিত হয় না - আনন্দই তার মূল উদ্দেশ্য'' আনন্দই তাহার আদি, অন্ত, মধ্য। আনন্দই তাহার কারণ এবং আনন্দই তাহার উদ্দেশ্য।[৫৫] (বৈশাখ ১২৯৪) অবনীন্দ্রনাথের শিল্পচিন্তায় তথা বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলীর বহু প্রবন্ধে (১৯২১ –১৯২৯) এই মতবাদই স্পষ্ট ভাবে অনুসৃত।'' আমি যখন আমার মনকে শুধোই - এই আয়োজন, এই ছবি মূর্ত্তির সংগ্রহ, এই লেকচার হল, শেখবার Studio, পড়বার লাইব্রেরী এর প্রয়োজন কোনখানটায়? কেনই বা এসব? মন আমার এক উত্তরই দেয় - হয়তো কোথাও একটি আর্টিস্ট পরমানন্দের একটি কণা নিয়ে আমাদের মধ্যে বসে আছে, অথবা আসছে কি আসবে কোনদিন সুন্দর যে ভাবে অতিথি হয় বিচিত্র রস, বিচিত্র রূপ আর গান নিয়ে, ষড় ঋতুর মধ্য দিয়ে - তারি জন্যে এই আয়োজন, এত চেষ্টা।''[৫৬] (১৩২৮, চৈত্র)

৫৫। রবীন্দ্রনাথ -'সাহিত্যের উদ্দেশ্য' সাহিত্য (৩য় সং ১৩৬৩) পৃ: ১৭৬
৫৬। অবনীন্দ্রনাথ - শিল্পে অনধিকার - বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী (অরুণা সং) পৃ: ১২

শিল্প সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলীতে যেখানে তিনি ভারত শিল্পের ব্যাখ্যাতা সেখানে তিনি স্বদেশ প্রেমিক রবীন্দ্রনাথের ভাবশিষ্য , যেখানে শিল্পের রসমূর্ত্তির পরিচয় দিয়েছেন সেখানে বার বার তাঁর ভাবনা পথে দেখা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ , বিশেষতঃ তাঁর সাহিত্য, সাহিত্যের পথে, বিচিত্র প্রবন্ধ প্রভৃতির চিন্তাধারা ।-

অবনীন্দ্র ভাবধারায় প্রেরণার খোরাক জুগিয়েছে 'শারদোৎসব' অচলায়তন' এবং ফাল্গুনী । অবনীন্দ্রনাথের খাতাঞ্চিমশায় প্রতিদিনের সংসারের অনুদারতা,কৃপণতা কঠিনতা এবং গতানুগতিকতার প্রতিমূর্তি । তাঁর কাছে কড়ির বাড়া কিছু নেই । ''মনিবের খাতাঞ্চি মশায় হিসবে লিখছেন, গোলাবাড়ির কোন কোণে কি জমা হ'ল, কোন ঘরে কি খরচ হল । কাজেই নামে গোলাবাড়ি হলেও সেখানে কেউ যে 'দে টপাটপ নে টপাশটপ ভাবনা কিছু নেই' বলে বেহিসেবি কান্ড করে হিসেব গোল করবে তার জো টি নেই'' ।[৪৪ ৫৭]
তাই খাতাঞ্চির জমা খরচের ঘরের বাইরে জানলার ধারে ফাগুন মাসের কোন গাছের মৌ লুট করে মৌমাছিটা গুণ গুণ করে কেবলই বাজে বকে যায় । আর শারদোৎসবের - লক্ষেশ্বরও শরৎকালের সোনার সকালে হিসেবের খাতা নিয়ে ব্যস্ত থাকে - - -

''ঠাকুর দাদা — আজ যে শরতে ছুটি , একটু আমোদ করবে না। গান গাইলেও তোমার কানে খোঁচা মারে । হায় রে হায় ভগবান তোমাকে এত শাস্তিও দিচ্ছেন ।

লক্ষেশ্বর - গান গাবার বুঝি আর সময় নেই । আমার হিসাব লিখতে ভুল হয়ে যায় যে।[৪৫]
আজ আমার সমস্ত দিনটাই মাটি করলে ।''

অবনীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত নাটক 'শিব সদাগর' প্রকাশিত হয় ১৯১৮ খৃঃ । তার আগেই প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনী' ১৯১৬ খৃঃ । 'শিব সদাগর' কে বলতে

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

৪৪। অবনীন্দ্রনাথ - খাতাঞ্চিরখাতা -কিশোর সঞ্চয়ণ -২য় সং পৃঃ ১
৪৫। রবীন্দ্রনাথ - শারদোৎসব,র.রশতবার্ষিকী সং ৬ষ্ঠ খন্ড পৃঃ ১৯০

শুনি —'' চল সবাই শিবসদাগর হয়ে ভেসে পড়ি। বিদেশে বিদেশে বাণিজ্য করে বেড়াবো, পাল তুলে দেবো, জাহাজ দেখতে দেখতে সমুদ্রের ওপারে চলে যাবে - ফটিক রাজার জমিদারী ছেড়ে একেবারে বাদশার মুলুকে।[৪৬] আর রবীন্দ্রনাথের যুবকের দল বলে''— চল রে সব চল। বুড়োর খোঁজে চল, যেখানে পাইত্যাকে পাকা চুলটার মত পট করে উপরে আনব।''[৪৭]

অবনীন্দ্রনাথের' ধরাপড়া' তোতাকাহিনীর দৃশ্যপটে রূপান্তর। তোতাকাহিনীর পাখির শিক্ষা যখন পুরা হয় সে তখন লাফায় না,

'' তার কি ওড়ে,

'' 'না' '

পাখি আসিল। সঙ্গে কোতোয়াল আসিল, ঘোড়সওয়ার আসিল। রাজা পাখিটাকে টিপিলেন, সে হাঁ করিল না, হুঁ করিল না। কেবল তার পেটের মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতা খস খস গজ গজ করিতে লাগিল।[৪৮] (তোতাকাহিনী)

'ধরা পড়ায়' সোঁসাই এর প্রাণ শুক বনের ভাষা ভুলে 'হরিবোল' বলে আবার রাজা যখন সোনার খাঁচা তৈরী করে রূপোর তালা তামার চাবি দিয়ে, আট আট চোবে দিয়ে মথুরায় নিয়ে যেতে পাঠান, তখন শুক পথে হরিবোল ভুলে অভ্যাস শেখা যাবিন্দের সলাপ -

---

৪৬। অবনীন্দ্রনাথ। শিবসদাগর' রং বেরং (২য় সং) পৃঃ ৪১

৪৭। রবীন্দ্রনাথ ফাল্গুনী' শতবার্ষিকী সং ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃ : ৫৬৩

৪৮। রবীন্দ্রনাথ' লিপিকা' ,, ৭মখণ্ড পৃঃ ৮১৪

~~৪৯। অবনীন্দ্রনাথ' ধরাপড়া' একে—তিন—তিনে—এক - ( ) পৃঃ ৭৬~~

বলে। তাই শেখানো বুলির প্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টি নিয়ে বড়কু বলে — ''পড়া পাখি যা শুনেছে তাই শিখেছে। যে নিজেরবোল ভুলতে পারে, হরিবোলও, ভুলতে তার বেশী দেরী হয় না শেখা বইতো নয়।''[৬২]

অবনীন্দ্রনাথের যাত্রা পালাগুলিতে যাত্রার গীতি বাহুল্যের প্রভাব যেমন আছে তেমনি রবীন্দ্র গীতিনাট্যের গীতিমূলক সংলাপের প্রভাবও কম নয়। অবনীন্দ্রনাথের যাত্রা নামধেয় রচনাগুলির কয়েকটির বিষয়বস্তু সামান্য কিন্তু গান এবং ছড়ায় তারা বিস্তারিত।-

অবনীন্দ্রনাথের সৃষ্টি কর্মের কি প্রাথমিক পর্যায়ে, কি শেষ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা অনুস্যূত হয়ে আছে গভীর ভাবে। অবনীন্দ্রনাথের বাল্যগ্রন্থাবলী ছাড়া গদ্যকবিতা রচনার মূলেও রবীন্দ্রনাথ আছেন'' আমার অনুরোধ ক্রমে একবার অবনীন্দ্রনাথ ঐই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।''[৬৩] সেই চেষ্টারই ফল' উত্তরা যাওয়া আসা, হাওয়া বদল, পাহাড়িয়া, মেঘমণ্ডল, রং মহল, হাটবার, তিন দরিয়া, আতসবাজি প্রভৃতি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত গদ্যছন্দ। কোনো বিশেষ বক্তব্য নয়, চিত্রশিল্পীর সৌন্দর্যমুগ্ধ দৃষ্টি যে দৃশ্যকে স্পর্শ করেছে, সেই দৃষ্টিই এই কবিতাগুলির প্রাণ। তবে বক্তব্যের বাহুল্য এগুলিকে ঠিক কবিতার সংযমের মধ্যে বেঁধে রাখতে পারেনি।

গাছ যেমন মাটির বুক থেকে রস আহরণ করে বিস্তারিত হয় পুষ্পপল্লবে - অবনীন্দ্রনাথ ও তেমনি রস আহরণ করেছেন রবীন্দ্র ভাব পরিমণ্ডল থেকে তারপর শিল্পীর - স্বাভাবিক নিপুনতায় বিকশিত হয়েছেন পত্র পুষ্পে।

৬২। অবনীন্দ্রনাথ —' ধরাপড়া' একেতিন তিনে এক' (২য় সং) পৃ :৭৬

৬৩। রবীন্দ্রনাথ - পুনশ্চের ভূমিকা- র.র. শতবার্ষিকী সং ৩য় খণ্ড।

২) ভারতী গোষ্ঠীর অন্যতমরূপে অপরাপর লেখকদের সঙ্গে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য -

'ভারতী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠা ১২৮৪ সনে, অবনী-দ্রনাথ তখন ছয় বৎসরের বালক মাত্র[১]। অবনী-দ্রনাথের সঙ্গে ভারতীর ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয় ১৩০৫ সনে, রবী-দ্রনাথ যখন ভারতীয় সম্পাদকত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে পুনরায় স্বর্ণকুমারী দেবী, তাছাড়া সরলাদেবী, হিরন্ময়ী দেবী, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্র কুমার রায় প্রভৃতি ভারতীয় ভার গ্রহণ করলেও, অবনী-দ্রনাথ ভারতীর লেখক গোষ্ঠীর অন্যতমরূপে এর শেষদিন পর্যন্ত অর্থাৎ ১৩৩৩ সাল অবধি বর্তমান ছিলেন। তাঁর যৌবনকালে প্রকাশিত অধিকাংশ ছোটগল্প, প্রবন্ধ এবং কবিতার বাহন হয়' ভারতী' পত্রিকা।

স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলা দেবী প্রভৃতির আমল থেকেই রবী-দ্র ভক্তি 'ভারতী' পত্রিকার লেখকদের অন্যতম সজ্ঞ সূত্র ছিল। পরবর্তী কালে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের অধিনায়কত্বে যে ভারতীয় আসরের প্রতিষ্ঠা হয় সেই সাহিত্যিক গোষ্ঠীর চৈত্যগুরু ছিলেন রবী-দ্রনাথ এবং দীক্ষাগুরু অবনী-দ্রনাথ।

" রবী-দ্রনাথের প্রতি অতুলনীয় ভক্তিই ভারতীয় দলের প্রত্যেককেই মাধ্যাকর্ষনের মতন একদিকে টেনে এনেছিল[২]।" সুতরাং রবী-দ্র প্রীতি ভারতীর বৈঠকের মূল ঐক্যসূত্র ছিল। - তাছাড়া প্রত্যেক লেখকের মধ্যেই কতকগুলি সাধারণ সাদৃশ্য অনুভব করা যায় — সেগুলি হচ্ছে সাহিত্য সৃষ্টিতে গতানুগতিকতার ঠুলি পরিত্যাগ, রচনারীতিকে সরস ও সরল করা ও চলিত ভাষায় অধিকতর সাহিত্য রচনা করা, — কারণ এ' দলের অনেকেরই একমাত্র ভাষা

১।২। *পরপৃষ্ঠায়

হচ্ছে চলতি ভাষা[৩] তৃতীয়ত : আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তাশীলদের রচনা ও ভাবজগতের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের পাঠকের একটি যোগাযোগ স্থাপন করা , চতুর্থতঃ সমসাময়িক সমাজের সমস্যার প্রতি বিশেষত : পতিতা নারীর প্রতি অবিচারের দিকে গল্পে উপন্যাসে দৃষ্টি আকর্ষণ করা ; তাছাড়া শিল্পানুরাগ এবং জীবনকর্যার্য তার অভিব্যক্তি ও মোগল চিত্রকলার অনুশীলনের আনুষঙ্গিক রূপে ফারসী শব্দের প্রতি ঝোঁক ।

অবনীন্দ্র নাথের ছোট গল্পগুলির মধ্যে যে সাদৃশ্যগুলি আমাদের প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেগুলি হচ্ছে মোগল শিল্পকলার অনুশীলন সূত্রে মুঘল ইতিহাসের ঘটনা বা মুঘল যুগের ভোগ ঐশ্বর্য আড়ম্বর উজ্জ্বল্যপূর্ণ রোম্যান্টিক জীবনের প্রতি আকর্ষণ এবং সেই সূত্রে ফারসী কবিতা উদ্ধৃতির প্রতি অনুরাগ এবং ফারসী কবি হাফেজের প্রতি শ্রদ্ধা এবং আকর্ষণ । তারই ফলে আমরা পাই — আলেখ্য (১৩১২) , আইনে চীনই (১৩১৬) , গঙ্গা যমুনা (১৩১৬) , যুগ্মতারা (১৩১৬) , প্রভৃতি মোগলযুগের ঘটনা এবং চরিত্র সমুন্নিত গল্পগুলি ।

১। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় -' রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ষোল বৎসর .... এমন সময়ে ১৮৭৭ খৃঃ জুলাই মাসে তাঁদের বাড়ী থেকে 'ভারতী' পত্রিকা বের হয় ।'' সাময়িক পত্রিকা ও রবীন্দ্রনাথ' - প্রবাসী ষষ্টি বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ পৃঃ৫৩

২। হেমেন্দ্র কুমার রায় - মণিলালের আসর' - মানসী ও মর্ম্মবাণী । ১৩৩৬ জ্যৈষ্ঠ পৃঃ৪১৬

৩। হেমেন্দ্র কুমার রায় — মণিলালের আসর' — মানসী ও মর্ম্মবাণী । ১৩৩৬ জ্যৈষ্ঠ পৃঃ ৪১৬

এদের মধ্যে আলেখ্য , গঙ্গাঁযমুনা , প্রভৃতি গল্পে মোগলযুগের শিল্প সমৃদ্ধির প্রতি লেখকের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি ভঙ্গী সহজেই অনুভব করা যায় — চারিদিকে শ্বেত পাথরের দেওয়ালে বিচিত্রবর্ণের লতাপাতা ফুলফল মণি মাণিক্যের মত ঝক ঝক করিতেছে । দেওয়াল গুলো যেন আয়নার মতো মসৃণ - - - - - - - - - - - এক মুহূর্তে আমার চোখের সম্মুখে মোগল শিল্পের সমস্ত গৌরব উদ্ঘাটিত হইয়া গেল [৪] ।রূপে রঙে রসে উজ্জ্বল মোগলযুগ তার উত্থান এবং পতনদুই নিয়েই লেখককে আকর্ষণ করেছিল , চিত্রশিল্পীর দৃষ্টিতে দেখেছিলেন তার বর্ণাঢ্যতা , প্রেমিকের বেদনায় অনুভব করেছিলেন , তার অধ :পতন' যুগান্তারা' গল্পের বর্ণনা এবং গল্পধৃত করুণ রস তারই পরিচয় দেয় ।- - -

''[redacted] সালেবেগ ছিল বাদশাহের মুহরী এবং চিত্রকর । - - - বাদশাহ যে গান রচনা করিতেন সেগুলিকে স্বর্ণাক্ষরে সাজাইয়া বিচিত্রচিত্রে ফুটাইয়া বাদশাহের কুতুব - খানায় ধরিয়া দেওয়াই তার কাজ ছিল । সে ছিল রঙ্গীলে মহম্মাদ শাহের জুঁররী কলম [৫] । নাদিরশাহ যখন শ্যেনপক্ষীর মত হিন্দুস্থানের তক্ত [তখত] -ই - তাউস নিয়ে চলে গেছেন - তখন সেই হৃত সর্ব্বস্ব বাদশাহের বেদনায় সালে বেগ মর্ম্মাহত , তারপরে নাদিরশাহকে হত্যা করে সে প্রভুর অপমানের প্রতিশোধ নেয় এবং এই দৃশ্য চিত্রপটে লিখে বাদশাহকে উপহার পাঠায় । সর্ব্বস্ব রিক্ত বাদশাহের প্রতি চিত্রকরের এই আনুগত্য এবং ভালবাসা গল্পটিতে একটি স্বতন্ত্র - রসসঞ্চার করেছে ।

আরও অন্যান্য গল্পের মধ্যে বড় গল্প হিসাবে উল্লেখ যোগ্য' কোটরা' । তথাকথিত

৪। অবনীন্দ্রনাথ' গঙ্গাঁ যমুনা' ভারতী ১৩১৬ পৌষ , ৯মসং পৃ: ৪৬ ৮
৫। .. .. যুগান্তারা .. ১৩১৬ বৈশাখ , ১ম সং পৃ: ৩

বাস্তব ও আধুনিকজীবন যা ভারতীর বহু লেখকের গল্পেই দেখা যাচ্ছিল -সেই শ্রমজীবীর জীবন এই গল্পের উপজীব্য । একটি হতভাগ্য শিশুর জীবনে দেবতার আশীর্ব্বাদের মতই এসেছিল তার পালিত বাবা আর মা - মাচাবু আর জুমনী । অনাথ নোটো নিঃসম্পর্কীয় ছোটজাত মাচাবু আর জুমনীর নৌকা 'কোটরার' আশ্রয়ে বেড়ে উঠতে থাকে । মাঝির জীবনের সঙ্গে তার জীবন স্রোত মিশে যায়, নদীর জলের সঙ্গে আর জুমনীর মেয়ের সঙ্গে তার হৃদ্যতা সখ্যের সীমা ছাড়ায় । তারপরে বহুদিন পরে তার প্রকৃত পিতা তাকে খুঁজে পায় এবং নিয়ে যায় শহরে । কিন্তু প্রকৃতির কোলে বুকভরা স্নেহের ছায়ায় বেড়ে ওঠা নোটো ভদ্র সভ্য জীবন সহ্য করতে পারে না। যেখানে সে জীবনের প্রভাতকাল কাটিয়েছে , সেই প্রকৃতির বুকে — প্রেম ভালবাসা -স্নেহ, সুখ -দুঃখ আনন্দ -বেদনার আবর্ত যেখানে ক্ষুদ্র তরঙ্গ ভঙ্গে ছুটে চলেছে, সেই স্নেহময়ী মায়ের কোলেই সে ফিরে আসে । গল্পটির চরিত্রগুলি জীবন্ত বর্ণনা মাধুর্য্যে এবং রসমাধুর্য্যে এটি রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের ছুটিকে' স্মরণ করায় ।

'কালোফুল' গৌরিয়া' প্রভৃতি কয়েকটি গল্প লেখকের রোম্যান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রতীকের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে । জীবনের শেষদিনটিই কালো ফুলের ফুটে ওঠার দিন । কালো মরণকে জীবনের অর্ঘ্যে আরাধনা করে তার মাঝে অমৃতের স্পর্শ রেখে যাওয়াই তার কাজ । রুদ্রের দক্ষিণমুখ নয়, তাঁর প্রলয়রূপের আরাধনায় অর্ঘ্য দিতে হবে ফুটে ওঠার সার্থকতাকে- ' কিন্তু আমি জানি আমি কালো ফুল ...... বেলচাঁপা কুন্দ করবীর মতো জীবনের ঐশ্বর্য্য নানাবর্ণে নানাছন্দে নিত্য ফুটিয়ে তোলা আমার কাজ নয় । জীবনের শেষদিনটি হচ্ছে আমার ফোটবার দিনটি - যেদিন আমার সকল

প্রাণ তার সমস্ত শোভা সমস্ত রং এক করে নিয়ে দেখা দেবে কালোডানা' প্রকাণ্ড এক প্রজাপতির মতো, ভোরের অন্ধকারে চুপি চুপি।'' শেষে শীতের হাওয়ায় আমার প্রেমের পাল ভরে সারারাতের অবিশ্রান্ত শিলাবৃষ্টি ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে আমাকে বেঁধে রেখেছিল যে চিত্রবিচিত্র চীনের টব সেটি। সেইদিন অকালের বাদলে আর আর বাক্সঝারাতের শঙ্খধ্বনির মাঝে আমার ফুল ফুটলো। বাসাবাড়ির আলসে ছেড়ে আমি এলাম আমার মায়ের ঘরে পথের পরে — বিয়ের এলোখোঁপার কালো ফুলে সাজিয়ে। রথের চাকার বুকের পাঁজর ভেঙে দেখা দিলেন আমার বর পথের শেষে দুর্দ্দিনের সে কালো ফুলের কালো ভ্রমর।[৬]'

অবনীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্পী সত্তা এবং সাহিত্যিক সত্তা বোধকরি ওতঃ প্রোতভাবে মিশে গেছে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'মোহিনী' 'গুরুজী' 'মতু' সেমুষি, টুপি, অম্পি, দোশালা প্রভৃতি গল্পগুলিতে। এই গল্পগুলিই পরে সঙ্কলিত হয় 'পথে বিপথে' গ্রন্থের 'নদীনীরে' অংশে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে অবনীন্দ্রনাথ কিছুকাল স্বাস্থ্যের জন্য সকালে বিকালে - স্টীমারে বেড়াতেন। এই স্টীমার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাকে পশ্চাৎপট করেই 'পথে - বিপথের নদীনীরে' অংশের গল্পগুলির প্রবর্ত্তনা।

বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে কল্পনার স্বপ্নজালে বোনা এই গল্পগুলি ভাষায় বর্ণনায় এবং কাহিনীতে নতুন স্বাদ বহন করে এনেছে। কয়েকটি কবি শিল্পী মানসের স্বপ্নাভিসার '' আমি একলা ঘরে; আর আমার মনের শিয়রে অন্ধকারের পর্দ্দার ওপারে মোহিনী।

---

৬) অবনীন্দ্রনাথ - কালোফুল - ভারতী ১৩২২ আশ্বিন পৃঃ ৫২৩.

যবনিকা তখনো সরেনি , চাঁদ তখনো ওঠেনি । এ সেই সব দিনের কথা যখন দয়ন্তীতে যখন মিনতির সুর অন্ধকারে লুটিয়ে পড়ে বিনয় করছে, এসো, এসো, দেখা দাও ।"[৭] অন্দি , গুরুজি , টুপি , দোলনা , মাতু সেমুমি , লুকিবিদ্যে , ছাইভস্ম, ইন্দু প্রভৃতি গল্পগুলিতে প্রতিদিনের বিবর্ণ অভিজ্ঞতার মধ্যে দীপ্তি ও সজীবতার সঞ্চার হয়েছে। গুরুজীতে আধুনিক ছোটগল্পের সঙ্গে আরব্য উপন্যাসের ধারা মিশে গেছে । স্বপ্ন, বাস্তবের সন্ধিক্ষণে দ্বিধা বিভক্ত লেখকচিত্ত 'অবু' এবং 'অবিন' এই দুই সত্তায় বিভক্ত , বক্তা অবু এবং অবিন ।'অবিন' বক্তারই বহির্নিক্ষিপ্ত মনোময় দ্বিতীয় স্বরূপ । অবিনের স্বপ্নাভিসারী কল্পনায় বাস্তবের সীমা ছাড়ায়, অবুকেও সঙ্গী করে , কিন্তু স্বপ্ন জাগরণের শেষে বাস্তবের কঠিন ভূমিতে ফিরে আসে অবু' ' তারপর হঠাৎ একটা প্রচণ্ড আলো আর শব্দের মাঝে মহাপুরুষ অন্তর্ধান করলেন । আমি চমকে উঠে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখলেম জাহাজের ডেকে শুয়ে আছি, অবিন কেবলই আমার মুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে , আমি যেন একটা স্বপ্ন থেকে জেগে উঠছি ।'''[৮] মাতু' গল্পে চিত্রিত চরিত্র বাস্তব ও কল্পনা এক হয়ে গিয়ে একটি গীতিকবিতার নিটোল মাধুর্য্য লাভ করেছে ।

পথে - বিপথের অপর দুটি অংশ সিন্ধুতীরে এবং গিরিশিখরে' - দুই টি ভ্রমণ কাহিনী । লেখকের শিল্প দক্ষতা , বর্ণণনাশক্তি এবং ভাষাচাতুর্য্য এগুলিতে চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে । অবনীন্দ্রনাথের উপমা উৎপ্রেক্ষা - কবিকল্পনার বিপুল রূপসম্ভারে এরা ভারতী গোষ্ঠীর অন্যান্য সচেতন ভাষাশিল্পী সাহিত্যিকের কথা স্মরণ করায় ।

৭। অবনীন্দ্রনাথ মোহিনী - পথে বিপথে - বিশ্বভারতী সং পৃ :.৬
৮। অবনীন্দ্রনাথ - গুরুজী' - পথে বিপথে - ,, পৃনঃ ৩০

'ভারতী' পত্রিকায় ছোটগল্প লেখক অবনীন্দ্রনাথ শুধু বড়দের জন্যে নয়, তিনি আরও গল্প বলেছেন এবং লিখেছেন ছোটদের জন্যে সেগুলি' একে তিন তিনে এক' 'রং বেরং' কিশোর সঞ্চয়ন' প্রভৃতি গ্রন্থে অধুনা সঙ্কলিত হয়েছে এবং বিভিন্ন বার্ষিকী গ্রন্থে ও কিশোর পত্রিকায় অনেকগুলি ছড়িয়ে আছে। এইসব গল্পগুলির কৌতুক রসের স্নিগ্ধ আমেজে, বাংলা - ফার্সী ভাষার অবাধ মিশ্রণে এবং কল্পনার উদ্ভটতে পাঠক মন জয় করে নেয়। সিকস্তি পয়স্তি কথা' গল্পে (রং বেরং) খাতাঞ্চি মশায় ও সোনাতন জীবন্ত চরিত্র হয়ে উঠেছে, যখন সোনাতনের সঙ্গে শকুন বিদ্যের আলোচনা করতে করতে খাতাঞ্চিমশায় অনায়াসে সক্রান্তি ঠাকুরকে উদভূটির চর থেকে উৎখাতে চক্রান্ত করেন। এই খাজাঞ্চি চরিত্র বার বার অবনীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে দেখা দিয়েছে এবং একান্ত বাস্তববাদী সজীব চরিত্র হিসাবে সার্থক হ'য়ে আছে।

১৩২৭ সালে ভারতী পত্রিকায় বারোয়ারী উপন্যাস রচনায় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি বয়ঃ কনিষ্ঠ সাহিত্যিক বৃন্দের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথও রচনায় অংশ গ্রহণ করেন। ১৩২৭ সালের কার্তিক সংখ্যায় তাঁর উপন্যাসাংশ প্রকাশিত হয়। উপন্যাসের মিলনান্তক পরিণতির দিকেই তাঁর রচনার প্রবণতা দেখা যায় এবং কৌতুকরসের স্বচ্ছ-আবরণে তাঁর রচিত অংশ যথেষ্ট উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

৩) প্রাবন্ধিক অবনী-দ্রনাথ -

'ভারতী' পত্রিকা ব্যতীত অন্যান্য বহু সাময়িক পত্রিকায় প্রধানত, অবনী-দ্রনাথকে আমরা দেখতে পাই শিল্প ব্যাখ্যাতা এবং শিল্পরসিক প্রাবন্ধিক হিসাবে। প্রাবন্ধিক হিসাবে তিনি কতটা সার্থক সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র বিচার্য কিন্তু প্রবন্ধের বিষয় বস্তুর বিভিন্নতায় তিনি উল্লেখযোগ্য। রবী-দ্রনাথের মতই শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা, সঙ্গীত প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। কোথাও বা 'বাজে কথা' প্রবন্ধের মত শুধু রসসৃষ্টি বা আনন্দদানই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছে।

অবনী-দ্রনাথেরঅপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির (১৮৯২ – ৯৩) মধ্যে যেকটিনটি ক্ষুদ্র গদ্য রচনা পাওয়া যায়, সেগুলি রবী-দ্রনাথের 'বিবিধ প্রবন্ধের' গোত্রভুক্ত। তুচ্ছ বিষয়বস্তু লেখকের মনোভাবটুকু ধরে রেখেছে এই হিসাবে গদ্যরচনাগুলির সার্থকতা। 'পুরানো বাড়ি' আগামনী ও বিজয়া এবং মেঘদূত; এই তিনটি রচনার মধ্যে 'মেঘদূত' রচনাটিই লেখকের বক্তব্যের অভিনবত্বে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৮৯২ খৃঃ বা ১২৯৮ সনের আষাঢ় মাসে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় 'সুহৃৎ সমিতিতে' মেঘদূত নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, সেটি - সাহিত্য' পত্রিকার ভাদ্র (১২৯৮) সংখ্যায় প্রকাশিত হয় –''সাহিত্য' পত্রিকায় তরুণ সম্পাদিক সুরেশচন্দ্রের 'মেঘদূত' কাব্যের যে এক দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিতহইয়াছিল তাহা পাঠ করিয়া রবী-দনাথের মনে যে কথাগুলি আসে, তাহা প্রবন্ধকারে লিখিয়াছিলেন; ..... মেঘদূত' ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিবার প্রেরণা পাইয়াছিলেন সুরেশচন্দ্রর দীর্ঘ সমালোচনা প্রবন্ধ হইতে।[১]''

১। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় - রবী-দ্রজীবনী - (১মখন্ড ৪র্থ সং) পৃঃ ৩১২

অবনী-দ্রনাথের' মেঘদূত' প্রবন্ধও সেই সুরেশচন্দ্রের' মেঘদূত' প্রবন্ধের সমালোচনা। এখানে লেখকের মনোভাবটুকুই স্পষ্ট পঠিত প্রবন্ধের সমালোচনা মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। সুরেশচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে বলেন -''বর্ষায় বোধকরি বিরহের প্রভাব কিছু বেশী। জগতের সব যখন মেঘের ছায়ায় ঢাকিয়া যায়, আকাশ যখন মেঘে আচ্ছন্ন ও অন্ধকার হইয়া আসে, তখন প্রাণেও বুঝি সেই অন্ধকারের ছায়া পড়ে। তখন প্রাণের ভিতর বুঝি খুঁজিয়া দেখিতে হয় - আমার বাঞ্ছিত, আমার প্রিয় আমার সর্ব্বস্ব কোথায়? মিলনের আলিঙ্গন সেই আঁধারে কোথায় মিশাইয়া যায় - বিরহের ভয়টাই যেন সকলের আগে জাগিয়া ওঠে[২]। রবী-দ্রনাথ ঐ সাহিত্য পত্রিকায় কার্ত্তিক অথবা অগ্রহায়ণ সংখ্যায় মেঘদূত' লেখেন এবং বলেন''যাহারা একটি সর্ব্বব্যাপী মনের মধ্যে এক হইয়াছিল তাহারা আজ সব বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাই পরস্পরকে দেখিয়া চিত্ত স্থির হইতে পারিতেছে না - বিরহে বিধুর বাসনায় ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছে। আবার হৃদয়ের মধ্যে এক হইবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু যাবখানে বৃহৎ পৃথিবী।''[৩] আর অবনী-দ্রনাথ তাঁর অপ্রকাশিত' মেঘদূত' প্রবন্ধে লিখলেন - -''জগৎ চিত্রের'' অসীম সৌন্দর্য্যের মাঝে গৃহের শোভা, প্রিয়জনের সুখস্মৃতি একদিন ভাল ফুটিতে পারে নাই, প্রকৃতির মধুর ছবিতেই আমাদের নয়ন আকৃষ্ট ছিল, গৃহের মর্ম্ম এতদিন বুঝিতে পারি নাই কিন্তু যখন মহান প্রকৃতির মহান চিত্রকর

২। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি -' মেঘদূত' সাহিত্য ২য়বর্ষ, ৫ম সং ভাদ্র ১২৯৮, পৃ:২০৬ -২০৭

৩। রবী-দ্রনাথ -মেঘদূত প্রাচীন সাহিত্য (১৩৫৬) পৃ : ৯৩

গৃহের শোভা ব্যতীত আর সমস্ত শোভা ধীরে ধীরে বর্ষার সুস্পষ্ট অন্ধকারে আবৃত করিয়া দিলেন তখন সেই গৃহ সেই প্রেমপূর্ণ প্রিয়মুখচ্ছবি স্পষ্টতর, উজ্জ্বলতর হইয়া আমাদের মোহিত করিল আমরা সেই শোভা পূর্ণরূপে উপভোগ করিতে ব্যাকুল হইলাম।''[৪]

অবনীন্দ্রনাথের শিল্প সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলির মধ্যে কতকগুলি প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথকে দেখতে পাই ভারতীয় প্রাচীন শিল্প ঐতিহ্যের ব্যাখ্যাতা এবং উদ্ধারকর্তা হিসাবে। 'ভারতশিল্পে মূর্তি' ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ, শিল্পদর্শিকা প্রভৃতি এই জাতীয় শিল্প সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের সঙ্কলন। তাছাড়া ভারতী, প্রবাসী, প্রবর্তক, বঙ্গবাণী প্রভৃতি পত্রিকায় শিল্প ঐতিহ্য বিশ্লেষণ মূলক বহু প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথ যে যুগে তাঁর শিল্প সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ রচনা করেন তখন অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তির মতে পাশ্চাত্য শিল্প এবং ভারতীয় শিল্প সম্পর্কে পাশ্চাত্য শিল্প সমালোচকের মন্তব্যই শিল্পবিচারের একমাত্র মাপকাঠি ছিল। হ্যাভেল সাহেবের সান্নিধ্যে এসে অবনীন্দ্রনাথই প্রথম তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে প্রাচীন শিল্পশাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুধু নয় শিল্পরসোদ্বোধের পুনরুজ্জীবন ঘটালেন। ভারতীয় পুরাতন কলাসংস্কৃতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ব্যক্ত করলেন, — ভারতশিল্প গ্রন্থের 'স্পষ্টকথা' কি ও কেন' শিল্পে 'ত্রিমূর্তি' শিল্পের ত্রিধারা' ভারতশিল্পে মূর্তি প্রভৃতি প্রবন্ধ ও গ্রন্থে। অতীতের শিল্পী যে শিল্প সৃষ্টি করে গেছেন একে শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করার মধ্যেই আজকের শিল্পের প্রতিষ্ঠা।-'' যে ভাবের বন্ধন প্রাচ্য শিল্পের সহিত নাড়ীর বন্ধনে আমাদের যুক্ত রাখিয়াছে সেই যোগসূত্র ছিন্ন করিলে কক্ষচ্যুত গ্রহের মত সর্ব্ব -

---

৪। অবনীন্দ্রনাথ —'মেঘদূত - অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির ২য় প্রবন্ধ, 'মোহন লাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

নাশের দিকেই নিপাত লাভ করিব ।"[৫] বলাবাহুল্য অবনীন্দ্রনাথের এই মনোভাবের উপরে তৎকালীন স্বদেশী আন্দোলন ভগিনী নিবেদিতা, হ্যাভেল প্রভৃতির প্রভাব যথেষ্ট ছিল । তবে একথাও সত্য যে প্রাচীনের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা নিবেদন করে মূলত: সংস্কৃতে নিবদ্ধ প্রাচীন শিল্পশাস্ত্রগুলি বাংলায় ব্যাখ্যা করলেও পরবর্তী কালে তিনি শিল্পক্ষেত্রে উদার বিচার - বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন । তখন একদিকে যেমন পাশ্চাত্য শিল্পের প্রতি অহেতুক মোহ ছিল তেমনি স্বদেশী আন্দোলনের যুগে পাশ্চাত্য শিল্পরীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীকে হেয় করবার উৎসাহও ছিল ; ভারতশিল্পের পুন: প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় অবনীন্দ্রনাথ, কালোর আলো' 'পথে পথে' ভাবসাধন' চিত্রে ছন্দ ও রস' প্রভৃতি ওজস্বিনী ভাষায় আবেগপ্রধান প্রবন্ধ রচনা করেছেন । কিন্তু পরবর্তী কালে জন্মভূমির প্রতি মমতাময় যেমন তাঁর সত্য সন্ধানী মন দেশ কালপাত্রের ঊর্দ্ধে উঠে শাশ্বত শিল্পরসের আস্বাদন করতে কুণ্ঠিত হয় নি । তেমনি আবার অনাদিকালের সুধারসের সন্ধান পেয়েও তিনি আপন ঘরের প্রতি আনুগত্য থেকে বিচলিত হননি । তারই নিদর্শন' উনোদুনো' প্রবন্ধ' আর্ট জিনিষটা যে কেবলি পূবদেশে এবং পূবের মধ্যে আমাদের দেশেই প্রবলভাবে আছে, সেটা বিশ্বাস করতে আমি তোমাদের মানা করছি । এখন আর শিল্পের জাতি বিভাগ নিয়ে লড়ালড়ি করে মরতে আমায় হাজার লোভ দেখিয়েও তোমরা নামিয়ে আনতে পারবে না। - - - - - বাজার আর সেখানকার দূর কষাকষিরহট্টগোল ছেড়ে পালিয়ে এসেই আমি বুঝতে পারছি যে কলাবিদ্যাধারী আর্টের যে মনস্তরে বাস

৫। অবনীন্দ্রনাথ - 'শিল্পে ত্রিকমন্ত্র' - ভারতী ১৩১৭, ২য় সংখ্যা - পৃ:১

করে, সেই নিম্নস্তর ছাড়িয়ে একটা জায়গা আছে, সেখানে কলা সরস্বতী পদ্মাসনে বিরাজ করছেন -- আর সেখানে জাতিভেদ নেই, দেশবিদেশের সব সেখানে সমান। সবাই নিজের নিজের পূজার অর্ঘ্য নিয়ে সেখানে চলেছে। সেখানে গ্রীক পার্শী, হিন্দু মুসলমান, চীনে জাপানী এসবে ভিন্নতা নেই, এ তর্ক ও নেই। আছে কেবল বিচার আর্ট কিংবা আর্ট নয়, নকল কিম্বা আসল আপনার কিংবা পরের, এমন কি নিজের আর্টও পূর্ব্বপুরুষের ধার করা পরস্ব কি না; এই বিচারই সেখানকার কথা, অন্য তর্কও নেই, কথাও নেই, বাগড়া ঝাটিও নেই।''[৬]

অবনীন্দ্রনাথ শিল্পাদর্শ এবং শিল্পতত্ত্ব সম্বন্ধেও বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধ রচনা করেছেন — যেগুলির অধিকাংশ বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলীতে' সঙ্কলিত হয়েছে। তাছাড়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পাদর্শের পার্থক্য, শিল্পীর আদর্শ কি হওয়া উচিত এ প্রসঙ্গে যুক্তি সহ আলোচনা করছেন দুইদিক'' 'রূপরেখা'' পথে পথে প্রভৃতি প্রবন্ধে। প্রবাসী পত্রিকায় ১৩১৬ সালে, শিল্প বিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতি অভিভাষণে তিনি শিল্পাদর্শ সম্বন্ধে তাঁর যে ব্যক্তিগত মত ব্যক্ত করলেন — তাতে তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিগত রুচিরই পরিচয় পাওয়া গেল। যিনি শিল্পের দেবতা তিনিও বিশ্বদেবতার মত সাধনার ধন। তাঁর জন্য হৃদয়ে শূন্য সিংহাসন বিছিয়ে রাখতে হবে -- তাঁর জন্য প্রাণ কাঁদতে থাকবে, তবেই তিনি সৌন্দর্য্য সাগর মন্থন করে উদয় হবেন। যে শূন্য মনে তাঁহারই আশা প্রতীক্ষা করে সেই তাঁহাকে নিশ্চিত পায়। সমালোচনা বা কুতর্কের দ্বারা নয়, হৃদয়ে শিল্পের দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

৬। অবনীন্দ্রনাথ -' উনোদুনো' - ভারতী পত্রিকা' ১৩২৬ ফাল্গুন, পৃঃ ৮৮৫

তাঁর মতে শুধুমাত্র অনুকৃতি বা অনুকরণের দ্বারা শিল্প হয় না। বাহিরের বস্তু দেখে সৌন্দর্যকে ধরা যায় না, তিনি চেয়েছিলেন কল্পনা বা ভাবের জগতে ছাত্রদের মনকে নিয়ে যেতে তাই বলেছেন - -"তার আগে কালিদাসের মেঘদূতের রসবরষায় সিক্ত কর, তবে আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিও, নব মেঘদূতের নূতন ছন্দ উপভোগ - করিবে; আগে মহাকবি বাল্মীকির সিন্ধুবর্ণন, তবে তোমার সমুদ্রের চিত্রলিখন। নচেৎ তোমার মেঘ কেবল ধূমরাশি আর সমুদ্র শুধু লবণাম্বু।"[৭]

কিন্তু এই ভাবপ্রকাশের উপায় কি ? শিল্পের আঙ্গিকগত কোন আদর্শ আছে কিনা এ' বিষয়ে তিনি কোন ইঙ্গিত দেননি। তবে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের আদর্শকে তিনি জ্ঞান বুদ্ধি শ্রদ্ধার দ্বারা গ্রহণ করলেও কার্যক্ষেত্রে নিজের ব্যক্তিগত মতকেই সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। তাঁর কাছে শিল্পীর জগৎ ও সাধারণ বহির্জগতের মধ্যে পার্থক্য আছে। আর্টিস্টের জগৎ কল্পনার জগৎ, মনোরাজ্য, সেখানে সাধনার দ্বারা পৌছাতে হয় -সেখানকার নিয়ম নিয়ন্ত্রিত নিয়মের থেকে স্বতন্ত্র। তাই বড় শিল্পীর মনের কাছে পৌছাতে হলে বড় সমজদারের ও প্রয়োজন।

অবনীন্দ্রনাথ শিল্পের ইতিহাস, ভারতীয় শিল্প ঐতিহ্য, শিল্পের আদর্শ সম্পর্কে বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন, কিন্তু তাছাড়াও কয়েকটি প্রবন্ধে প্রবন্ধকারের যুক্তি বুদ্ধিকে অতিক্রম করে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে একটি রোম্যান্টিক ভাবুক কবিমন। সেই মনই পূর্ণিমার ব্রত পালনের মধ্যে দেখেছে সীমা অসীম, খন্ড অখন্ডের লীলা, পূর্ণতাকে জগৎ -

---

৭। অবনীন্দ্রনাথ - শিল্পের দেবতা - প্রবাসী - ১৩১৬ কার্তিক., পৃ :৪৮৩

আলিঙ্গন করতে চাইছে পারছে না - পূর্ণিমার লীলা এই নিয়ে । পরিপূর্ণ সৌন্দর্য যারা চায় তাদের মধ্যেই রয়েছে মহাঅতৃপ্তি মহৎ বেদনা । বিচিত্রকে নিয়ে বাস, দুইকে নিয়ে বাদন, সাতকে নিয়ে সুর আর খণ্ডকে নিয়ে অখণ্ডের লীলা । পরিপূর্ণ আলোকের কাছে গ্রহচন্দ্র তারকা হার মানে, পরিপূর্ণতার স্বপ্ন ধরেই থাকে, বিশ্বজগৎ আপনার মাঝে তাকে অনুভব করে কিন্তু প্রত্যক্ষ করতে পারে না । সব আর্ট সব রচনা, সব কাজ মানুষেরও, এইভাবে হার স্বীকার করে আপনার আপনার পূর্ণ আদর্শের কাছে । এই যে অপরিপূর্ণতার বেদনা, এ বেদনা সমস্ত কবিশিল্পীরই বেদনা — এই মহৎ অতৃপ্তি এবং বেদনাকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ তাই তিনি মহৎ শিল্পী ।

লোকসাহিত্য আলোচনা এবং সংগ্রহের প্রাথমিক কৃতিত্ব রবীন্দ্রনাথের । ছিন্নপত্রের যুগেই তিনি এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন'' আমার এবার কার মেয়েলি ছড়া, প্রবন্ধটাতে কতকটা বলেছি যে, ছেলেদের যে আনন্দ সেটাই বিশুদ্ধ আনন্দের আদর্শ ।''[৮] (সাতারা ৯ ই অকটোবর, ১৮৯৩) — এই সময়েই রচিত হয় 'লোকসাহিত্যের' অন্তর্গত '' ছেলে ভুলানো ছড়া'' ইত্যাদি প্রবন্ধ । অবনীন্দ্রনাথ যদিও ছড়া সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন অনেক পরে কিন্তু আমরা দেখেছি ঐ সময় থেকেই তাঁর রচনায় (ক্ষীরের পুতুল - ১৮৯৬, ১৩০২) বাংলার মেয়েলি ছড়ার বাচনভঙ্গি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত হয়ে যায় । পরে - রবীন্দ্রনাথ এবং বিচিত্রা সভার (১৯১৪) অনুপ্রেরনা থেকেই অবনীন্দ্রনাথ মুসলমানী পুঁথি,

---

৮। রবীন্দ্রনাথ — পত্রসংখ্যা ১৫৯, ছিন্নপত্রাবলী র.র.শতবার্ষিকী সং ১১শ খণ্ড পৃ : ১৭৮

গ্রাম্য ব্রতকথা ব্রতের আলপনা, কাঁথার নকশা, ইত্যাদি সংগ্রহে প্রত্যক্ষ ভাবে অংশ গ্রহণ করেন এবং ঐ সম্বন্ধে আলোচনায় অগ্রসর হন। বাংলার গ্রামের অন্তঃপুরে যে শিল্প লোকচক্ষুর অন্তরালে সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিকতায় সুন্দর, প্রাণের আবেগে সজীব সেই লোকশিল্পের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ অবনীন্দ্রনাথের অন্যতম কীর্তি। বিংশশতকের প্রথমাবধিই লোকশিল্পের এবং সাহিত্যের সংগ্রহে উৎসাহ দেখা যায় -

"As a matter of fact, the study of survivals of traditional arts and crafts had already begun to take shape in Bengal during the past half of this century" [১]

এক্ষেত্রে যাঁরা অগ্রণী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য - - অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনেশচন্দ্র সেন এবং গুরু সদয় দত্ত।

'অবনীন্দ্রনাথ' তাঁর অভিজ্ঞতা এবং চিন্তার ফল লিপিবদ্ধ করেন' বাংলার ব্রত' গ্রন্থে 'বাংলার ব্রত' প্রথম কয়েকটি প্রবন্ধের সমষ্টি হিসাবে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় ভারতী পত্রিকায় ১৩২৫ বঙ্গাব্দে কার্তিক থেকে ফাল্গুন সংখ্যা পর্যন্ত। পরে ১৯১৯ সালে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। অবনীন্দ্রনাথ গ্রন্থটিতে শুধু বাংলার ব্রতের আলোচনা করেন নি ব্রতের আলপনার নকসা যথাযথ অবিকৃত ভাবে সংগ্রহ করেছেন - " কি মণ্ডন চিত্র হিসাবে কি স্বকীয়তা পরিকল্পনা এবং উদ্ভাবনার দিক দিয়ে বাংলার মেয়েদের হাতে এই লেখা শিল্পী মাত্রেরই যে আদর পাবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। নকসাগুলি আমি যথাসম্ভব

১। Sudhangsu Kr. Roy — 'The Rituals Art of the Bratas of Bengal : (1961) - Introduction, Page iii.

অবিকৃত ভাবে নকল করে প্রকাশ করেন।[১০] ...

''অবনীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র শিল্পী নহেন, ভারতীয় শিল্পের ইতিহাস এবং তত্ত্বকথা সুগম্ভীর ভাবে অনুশীলন করিয়াছেন, বাংলার ব্রতের আলপনাকেও তিনি কেবলমাত্র বাংলাদেশের বিচ্ছিন্ন একটি লোকশিল্প হিসাবে দেখেন নাই, ভারতীয় বৃহত্তর শিল্পচেতনার সঙ্গে তাহাদের যোগ লক্ষ্য করিয়া সেই অনুযায়ী তাঁহার আলোচনাকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন।'[১১] বাংলার ব্রত আলোচনায় ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের এই মত সমর্থনযোগ্য। আমরা দেখেছি ঠাকুর পরিবারের উত্তরাধিকার সূত্রেও হোক বা পরিবেশগুণেই হোক অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন শিল্পসাধনায় একটি অখণ্ড দৃষ্টির অধিকারী। তাই শুধু বাংলাদেশকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা তাঁর মত উদারদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়নি। বৃহত্তর ভারত তথা আন্তর্জাতিকতার পরিপ্রেক্ষিতে ব্রতের আলোচনা তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। সেইজন্য বাংলার লক্ষ্মীপূজোর সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন "মেকসিকোর" কোজাগর লক্ষ্মীর সঙ্গে ''লক্ষ্মীপূজোর সঙ্গে কলার পেটোর উপরে তিনটি - পিটুলির পুতুল সবুজ, হলুদ, লাল তিনরঙে প্রস্তুত করে রাখা হয়। এই পুতুলগুলিও অনার্য্য লক্ষ্মীপূজোর নিদর্শন। এই তিনপুতুলকে বলা হয় লক্ষ্মী নারায়ণ আর কুবের। কিন্তু এরা আসলে যে কি তা আমরা দেখব। সবুজ, হলদে, লাল, পুতুল আর অলক্ষ্মী বিদায়ের ছেঁড়া খানিক মাথার চুল - এই গুলির কোনো অর্থ অন্যদেশের ধর্ম্মানুষ্ঠানে পাই কিনা দেখি। "মেকসিকোতে" কোজাগর লক্ষ্মীপূজোয় মেয়েরা এলোকেশী হয় - শস্য যেন এই এলোকেশের মতো গোছা গোছা লম্বা হয়ে ওঠে এই কামনায়।

১০। অবনীন্দ্রনাথ - বাংলার ব্রত (১৯১৯) নিবেদনপত্র।

পাদটীকা - ১১। পরপৃষ্ঠায়।

" The women of the village wore their hair unbound and shook and tossed it, so that by sympathetic magic the maize might take the hint and grow correspondingly long". (Myths of Mexico and Peru) - "

ঐ - মেক্সিকোর পুরাণে আরো দেখা যাচ্ছে, শস্যের রক্ষয়িত্রী তিন - বর্ণের তিন দেবতা। একজন অপক্ক হরিৎ শস্যের সবুজ, এক ফলন্ত স্বর্ণশস্যের হলুদ এবং আর এক আতপতপ্ত সুপক্ক শস্যের সিন্দুর বর্ণ।''[১২] - - অবনীন্দ্রনাথের অখণ্ড শিল্পদৃষ্টির পরিচয় স্বরূপ, এই দীর্ঘ উদ্ধৃতির প্রয়োজন হ'ল। তাছাড়া ব্রতের উৎস সন্ধানে আর্য্য অনার্য্যের যৌথ দানের স্বীকৃতিতেও ব্রতের সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট।'' এটাও ঠিক যে ভারতবর্ষের বাইরে থেকে যাঁরা এলেন এবং এদেশের মধ্যে যাঁরা ছিলেন সেই আর্য্য এবং না আর্য্য বা 'অন্যব্রত' দের মধ্যে সব দিক দিয়ে এমন কি বিয়েতে এবং ভোজেতেও - আদান প্রদান চলেছিল। পুরাণের দেবদেবীর উৎপত্তির ইতিহাস এই আদান প্রদানের ইতিহাস, ধর্ম্মানুষ্ঠানের দিক দিয়ে শাস্ত্রীয় ব্রতগুলির ইতিহাসও তাই;"[১৩] ভারতের শিল্পচর্চায় এই সব অন্যব্রতদেরও যথেষ্ট অবদান আছে - -

১১। ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য - অবনীন্দ্রনাথ ও বাংলার ব্রত - অমৃত - ১১শবর্ষ, শ্রাবণ ১৫শ সং, ১৩৭৮, পৃঃ ১৪

১২। অবনীন্দ্রনাথ - বাংলার ব্রত (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ) পৃ : ২৬

১৩। " " পৃঃ ১৬

অবনীন্দ্রনাথ ব্রতের আলপনা, ছড়া ইত্যাদির বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেটিও প্রমাণ করতে চেয়েছেন। আমাদের মতের সমর্থনে বিদগ্ধ সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য মনে করি" যখন পর্যন্তও ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখকগণ ভারতীয় সংস্কৃতি বলিতে কেবল আর্য্য সংস্কৃতিই বুঝিতেন অর্থাৎ ভারতীয় সংস্কৃতির মৌলতম উপকরণটির জন্যও একমাত্র বেদকেই এক এবং অদ্বিতীয় মনে করিতেন, তখন অবনীন্দ্রনাথ পাণ্ডিত্যের এই সংস্কার হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিয়া এই বিষয়ে অনার্য্য সংস্কৃতির দাবীকেও স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।"[১৪] এইটি অবনীন্দ্রনাথের সংস্কারমুক্ত সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়। তথ্য, তত্ত্ব ও শিল্পের আলোচনায় বাংলার ব্রত বিশিষ্ট।

সমসাময়িক কালের অন্যান্য ব্রতকথা সংগ্রহের[১৫] সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের পার্থক্য হচ্ছে যে 'বাংলার ব্রত' শুধুমাত্র ব্রতকথা বা ব্রতের আলপনার সংগ্রহ নয়, এটি বাংলার ব্রতের নব মূল্যায়ণ। শাস্ত্রের বন্ধন থেকে মুক্ত করে শৈল্পিক ও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্রতের আলোচনা ও বিচার। অবনীন্দ্রনাথ খুঁজতে চেয়েছেন - - "ব্রতের মূলে কতখানি ধর্ম্ম প্রেরণা কতখানি বা শিল্পকলা - সৃষ্টির বেদনা রয়েছে তা বোঝা শক্ত।"[১৬] ব্রতের মূলে ধর্ম্মাচরণের যে অংশ সেটি মূর্ত্তিপূজার দিকে এগিয়ে গেল এবং শিল্প অংশ ক্রমে নাচ, গান, অভিনয়, আলপনা, ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে শিল্পের উচ্চতর একটি স্থানে পৌঁছতে চলল। শেষ পর্যন্ত দেখেছেন যে ব্রত আচরণ এবং শিল্পক্রিয়া দুয়েরই মধ্যে একটি জিনিষ রয়েছে সেটি কামনার আবেগ। যা কামনা তাই তৎক্ষণাৎ চরিতার্থ হ'ল, এ ব্রত নয়, আবেগ থাকা চাই - যেটা নানা ক্রিয়ার মধ্যে গতি পেয়ে পরিসমাপ্তি পাচ্ছে। "ব্রত

১৪। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য - "অবনীন্দ্রনাথ ও বাংলার ব্রত", অমৃত, শ্রাবণ ১৩৭৮,
১৫। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার; আশুতোষ মজুমদার; কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন প্রভৃতি সংগ্রহ
১৬। অবনীন্দ্রনাথ - বাংলার ব্রত - (বিশ্ব বি. সংস্করণ)- পৃঃ-৬৪

''ব্রত হ'ল মনস্কামনার স্বরূপটি। আলপনায় তার প্রতিচ্ছবি, গীতে বা ছড়ায় তার প্রতিধ্বনি, এবং প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তার নাট্যে, নৃত্যে, এককথায় ব্রতগুলি মানুষের গীত কামনা, চিত্রিত বা গঠিত কামনা, সচল জীবন্ত কামনা।''[১৭]

রবীন্দ্রনাথ 'ছেলেভুলানো ছড়ার' কাব্যরসে আকৃষ্ট হ'য়ে ছড়া সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন'' আমাদের ভাষা এবং সমাজের ইতিহাস নির্ণয়ের পক্ষে সেই ছড়াগুলির বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে একটি সহজ স্বাভাবিক কাব্যরস আছে সেইটিই আমার নিকট অধিকতর আদরণীয় বোধ হইয়াছিল।''[১৮] অবনীন্দ্রনাথ ও ছড়াকে সমাজজীবনের ছবি এবং কাব্যরস সমৃদ্ধ বলে উল্লেখ করেছেন। উপরন্তু তিনি ছড়ার মধ্যে দেখেছেন নাটকীয়তার আভাস এবং চিত্রশিল্পের আঙ্গিক। ছেলেভুলানো ছড়ায় দেখেছেন'' ছবি আঁকার আর্ট, কথা বলার আর্ট, যায় সুর ধরার আর্ট এক সঙ্গে মিলে একছড়া হার হ'য়ে - উঠেছে যেন।[১৯] বায়স্কোপের চলন্ত ছবির চেয়ে জীবন্ত ছবি দেয় ছড়া। ছড়াকে একেবারে গেঁথে দিয়েছেন ছবির ফ্রেমে।'' এবারে ছবির পালা একেবারে প্রাচ্য শিল্পের - Water painting -

''এপারে ঢেউ, ওপারে ঢেউ
মধ্যিখানে বসে আছে গঙ্গারামের বউ।

পাশ্চাত্য শিল্পের Cloud - effect

" উত্তরেতে মেঘ করেছে গরু যাচ্ছে উড়ে।
পেয়াদা বেটা পাগ বেঁধেছে সরধানের চিঁড়ে।''

১৭। অবনীন্দ্রনাথ — 'বাংলার ব্রত' – (বিশ্ব.বি.সং) – পৃঃ-৬৪
১৮। রবীন্দ্রনাথ – 'ছেলেভুলানো ছড়া' – (লোকসাহিত্য) – শতবর্ষ সং - ১৪শ খণ্ড – পৃঃ-৬৬৭
১৯। অবনীন্দ্রনাথ – 'ছেলেভোলানো ছড়া – ভারতী – ১৩৩০, বৈশাখ – পৃঃ-৬

একেবারে Sun-set land scape -

'' আকাশেতে মেঘ করেছে সূর্য্যি গেল পাটে
খুকু গেছে জল আনতে পদ্মদীঘির ঘাটে
পদ্ম দীঘির কালো জলে হরেক রকম ফুল
হেঁটোর নীচে দুলছে খুকুর গোছাতরা চুল ।''

দেওয়ালে আলপনার গাছ - decorative painting,

'' এক যে গাছ ছিল , লতায় লতিয়ে গেল
তার এক কুঁড়ি ছিল
ফুল ফুল ফুল ফুটে গেল ।'' [১৫]

অবনী-দ্র নাথের মতে এই ছড়াগুলোকে বলা যেতে পারে সাহিত্যের cubism কারণ পুরো ছবি দেওয়া, পুরোপুরি চেহারা কিংবা বর্ণনা দেওয়া, ঠিক যাকে ছড়া বলে তাতে নেই ।'' ছেলের মনের উৎসুক্য জাগিয়ে তাকে সত্যি সত্যি জাগিয়ে রাখাতো ছড়ায় উদ্দেশ্য নয় , বেশীর ভাগ ছড়াই ঘুম পাড়াতে গাওয়া হয় ছেলেকে অন্য মনস্ক করে দিতে বলা হয় । টুকরো টুকরো ছবি একটার ঘাড়ে আর একটা এই ভাবে পড়তে পড়তে ছেলের চোখ ও মন আপনিই বিমিয়ে আসে , এই টুকু করা হল , ছড়া বলার উদ্দেশ্য ও আর্ট । [১৬] গল্প, কথকতা ইত্যাদি অন্য আর্টের সঙ্গে ছড়ার আর্টের তফাৎ এইখানে ।"

১৫। অবনী-দ্রনাথ ছেলেভোলানো ছড়া - ভারতী (১৩৩০) বৈশাখ পৃ : ৭

১৬। .. .. পৃ: ১৩

রবীন্দ্রনাথ এই মেয়েলি ছড়ার মধ্যে আস্বাদন করেছিলেন, একটি অপূর্ব্ব আদিমতা, আদিম সৌকুমার্য্য; সেই মাধুর্য্যকেই নাম দিয়েছেন বাল্যরস'। অবনীন্দ্রনাথ ও দিনের ঘুমের ছড়া, রাতের ঘুমের ছড়া প্রভৃতির মধ্যে দেখেছেন হাস্য, করুণ, অদ্ভুত নানা রসের সমাবেশ। মেয়ের বিয়ের ছড়ায় পেয়েছেন বাংলার প্রাণের সাড়া। এই ছড়ার মধ্যে দেখেছেন আবহমান কালের বুক থেকে ভেসে আসা দেশকালপাত্র ভেদহীন এক সার্ব্বজনীন আবেদন। শিশু যেমন জাতহীন, তেমনি ছড়ারও জাত নেই, এরা বিশ্বজনীন। বঙ্গোপ সাগরের তীরে - মা যেমন ছেলেকে ঘুম পাড়ান -''ঘুম ঘুম ঘুম ঘুমচি গাছের পাতা'' ভূমধ্য সাগরের তীরে মা গান - - "Lemon blossom slumber too the bolsom on their stem". -

ছড়া যেমন সর্ব্বজনীন, চিরন্তন তেমনি আবার দেশ কাল - ইতিহাস - সমাজ লোক - ব্যবহারের ছাপ নিয়েও ছড়া তৈরী হয়েছে। বর্গী আসার সঙ্গে সঙ্গে তা ধরা পড়ে গেছে ছড়ায় বিদেশী আসার খবরও রটে গেছে মায়েদের মুখে মুখে -

''এক নৌকো আলো চাল -
এক নৌকো ঘি
দাদা গেছেন বে কর্তে ইঙ্গরজ রাজার ঝি।''

এরা ইতিহাসের খবরের মত শুকনো হ'য়ে আসেনি এরা এসেছে রসালো হ'য়ে তখনকার সুখ দুঃখ আনন্দবেদনার সংবাদ ব'য়ে।

লোকসাহিত্য পর্য্যায়ভুক্ত ছড়া অবনীন্দ্রনাথ সাধারণ সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে সব প্রবন্ধ রচনা করেছেন তার মধ্যে শিশু সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধই প্রধান। যেহেতু তিনি শিশু সাহিত্যিকের অন্যতম তাই অনেক জায়গায় তাঁকে শিশু সাহিত্য সম্পর্কে বলতে হয়েছে। 'রংমশাল' প্রীতি উৎসবে সভাপতির অভিভাষণ''

'শিশু সাহিত্য' সম্পর্কে একটি ক্ষুদ্ররচনা। শিশুমনের সঙ্গে সংযোগ রেখে শিশুদের জন্য সাহিত্য রচনা করতে হবে, এই ছিল তাঁর মূলবক্তব্য।

তথাকথিত পুঁথিগত বিদ্যার প্রতি রবীন্দ্রনাথের মত অবনীন্দ্রনাথেরও ছিল তীব্র অনীহা। বিদ্যালয়ের বাঁধা গণ্ডীর মধ্যে শিক্ষা লাভ করলে সে শিক্ষা যে সব সময়ে সত্য হ'য়ে ওঠে না, এই সিদ্ধান্তে তিনি রবীন্দ্রনাথেরই ভাবশিষ্য। ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'চৈতনচুটকি' — তৎকালীন সমাজব্যবস্থা, শিক্ষা পদ্ধতির প্রতি এই রকমই একটি ব্যঙ্গমূলক রচনা। ছেলেমানুষী বিদ্যে' (ভারতী ১৩৩০ কার্তিক) ছেলেমানুষী শিক্ষা (ভারতী ১৩৩০, অগ্রহায়ণ) এই দুটি প্রবন্ধে দেখা যায় শিক্ষা বিষয়ক চিন্তায় অবনীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথেরই অনুগামী।''গুরুমশায়ের তাড়না শিশুকে স্বাভাবিক বিকাশের পথ থেকে উল্টো মুখে ফিরিয়ে দেয়। জীবন সংগ্রামে পটু হতে শিক্ষা দেয় না। ভয়ের বেড়া টেনে সে শিক্ষা শিশুকে কাপুরুষ করে তোলে। প্রাচীন কালে আশ্রমবাসী ছাত্র এবং গুরুর মধ্যে হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল। মানুষে মানুষে এবং মানুষের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির মিলনে নবীন শিক্ষার্থীর দিনগুলি হৃদ্য হ'য়ে উঠতো। কিন্তু আজকের বিদ্যালয়ে বিদ্যা পণ্য বস্তু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে হৃদয় সম্পর্কহীন পুঁথিগত বিদ্যাই সেখানকার অবলম্বন।

অবনীন্দ্র নাথের ব্যক্তিগত জীবনে স্মরণীয় ব্যক্তি যাঁরা এসেছিলেন, পরিণত বয়সে তাঁদের উদ্দেশ্যে স্মৃতি অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন প্রবন্ধের মাধ্যমে। বড় জ্যেঠামশায় দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-আত্মীয়দের মধ্যে তাঁর কতখানি শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন তার

পরিচয় পাওয়া যায় ঐ নামাঙ্কিত রচনাগুলির মাধ্যমে। তাছাড়া তাঁর শিল্পজীবনে এসেছেন - ই.বি. হ্যাভেল, স্বর্গগত শ্রীযুক্ত ওকাকুরা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়, প্রভৃতি বহু মনীষী। প্রত্যেকের সঙ্গেই যে তাঁর আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, এই ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণগুলি তারই নিদর্শন।'' মনের কোণে ধরা অফুরন্ত বিরহের দীপশিখা তারি আলোতে নিত্যনূতন ভাবে মিলনের এবং বিরহের দুইছন্দ একখানি করে গাঁথা হয় স্মৃতিহার যা মনকে উন্মনা করে, আনমনা করে, অনন্যমনা করে। কাঁটার আগায় ফুল হ'ল স্মৃতি, দুঃখের নিধি হ'ল স্মৃতি।'' এই স্মৃতির অর্ঘ্যকেই নিবেদন করেছেন শ্রদ্ধার পাত্রে।[২২]

২২। অবনীন্দ্রনাথ - জগদিন্দ্রনাথের স্মরণে - মানসী ও মর্ম্মবাণী (১৩৩৩) ফাল্গুন, ১মসংখ্যা পৃঃ ২০ -২১

৪) অবনী-দ্রনাথের যাত্রা পালা নাটক কথকতা -

আজীবন নাটকের আবহাওয়ায় মানুষ অবনী-দ্রনাথ নাটক রচনা এবং নাটকাভিনয় উভয়ের প্রতিই প্রথমাবধি সমান পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন । তবে আমাদের কাছে কৌতূহল জনক হচ্ছে যে, তিনি যে নাটক রচনা করলেন সেগুলো তাঁর শৈশবে দেখা ঐতিহাসিক বা রোম্যান্টিক ট্র্যাজেডি বা রবী-দ্রনাথের তত্ত্বমূলক নাটকের মত কোনদিনই গুরুগম্ভীর নাটক হ'ল না । অবনী-দ্রনাথের অন্তরের কোন মহলে যে একজন কৌতুকাভিনেতা ছিল, সে -ই কৌতুকের নির্ঝর অদ্ভুত উচ্চটের সমাবেশে নিজেকে প্রবাহিত করেছে যাত্রাপালা - নাটক কথকতায়। খ্যাপা অবনঠাকুর' নাটুকে অবনঠাকুর' সর্বোপরি চিত্রশিল্পী অবন ঠাকুরের আর এক স্বকীয়তার নিদর্শন এই যাত্রাপালা কথকতা নামধেয় বস্তু গুলি । রবী-দ্রনাথ এই অদ্ভুত সৃষ্টির দিকে কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টিক্ষেপ করে পরম স্নেহের সুরেই বলেছেন - -

'' অবন , - রঙমশালে - তোমার লেখাটা পড়ে ভারি মজা লাগল ।

এরকম বিশুদ্ধ পাগলামির কারুশিল্প আর কারো কলম থেকে বেরোবার জো নেই ।" - - - রবি কাকা ।''[১]

অবনী-দ্রনাথ ছিলেন আজন্ম খেয়ালী , কোন বাঁধা ধরা পথে , বাঁধা নিয়মে চলার

১। রবী-দ্রনাথ - বিশ্বভারতী পত্রিকা - অবনী-দ্র সংখ্যা -
কার্ত্তিক চৈত্র (১৮৮১ – ৮২ শক) , পৃ : ২০২

মত মনোভাব তাঁর একেবারেই ছিল না। শিল্পের ক্ষেত্রেও ঘুরেফিরে এই একই কথা বার বার বলেছেন। ''আর্টিষ্টের চলা আনন্দের চলা – হাতুড়ি পিটে কলম চালিয়ে, সোনা গলিয়ে, হীরে কেটে, সুর ভেঁজে তাল ঠুকে, শাস্ত্রের অঙ্কুশ খেতে ইন্দ্রের ঐরাবতের মতো চলা নয়। আর্টের প্রকরণ নিরঙ্কুশ প্রকরণ, আর্টের পন্থা নিরঙ্কুশ পন্থা এইজন্য বলা হয়েছে' কবয়ো: নিরঙ্কুশা:।[২] (শিল্পের ক্রিয়া প্রক্রিয়ার ভালমন্দ)। এই রচনাগুলো সেই নিরঙ্কুশ স্বাধীনতায় পথ কেটে চলার নিদর্শন।

আমরা আগেই দেখেছি অবনীন্দ্রনাথের মানসলোকে মেয়েলি ছড়ার একটি বিশিষ্ট প্রভাব এবং বিশেষ স্থান আছে। এই ছড়ার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন – ''ছড়ার মধ্যে দুটো দিক রয়েছে দেখ, একদিক হচ্ছে প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে ছোটখাট সব ঘটনার মধ্যে দিয়ে বাস্তবের সঙ্গে তার বাঁধন, আর একদিকে হ'ল ছড়াটা সম্পূর্ণ মুক্ত, কল্পনা ও অবাস্তবের রাজ্যে। এই আছি চোখে দেখা জগতে, এই গেছি মনে ভাবা কল্পনারাজ্যে। একই ছড়ার মধ্যে দিয়ে এইরকম বাস্তব – অবাস্তব দুইয়ের ঢেউয়ের খেলা দেখি।''[৩] এই মনস্তত্ত্বের প্রভাব অবনীন্দ্রনাথের এই যাত্রাপালাগুলোর মধ্যে দেখতে পাই, এগুলি ছড়ার মতই এলোমেলো, অসংলগ্ন, এরা হঠাৎ ভেসে আসা মেঘের মত কোন ভার নিয়ে আসেনা যায়, কিছুটা বারিবর্ষণ করে অন্তর্হিত হ'য়ে যায়, মনে কোন ছাপ রাখে না। এরা কোন শিল্পীর স্বপ্ন নয়, পথের বন্ধু। পথের মধ্যে আমরা যেমন কোনো কার্যকারণ

২। অবনীন্দ্রনাথ – বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী – ১ম রূপা সং – পৃ:–১৫৫
৩। " – 'ছেলেভোলানো ছড়া' – ভারতী – ১৩৩০, বৈশাখ – পৃ:–১১

সম্বন্ধ খোঁজবার আশা করি না, এদের মধ্যেও কার্যকারণ সম্বন্ধ আশা করা বৃথা। কোনো নির্দিষ্ট আঙ্গিক বা প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য অলঙ্কার শাস্ত্রের কোনো বাঁধাধরা ছকের মধ্যে এদের গন্ডীবদ্ধ করা যাবে না। উদাহরণ স্বরূপ আমরা তাঁর এই যাত্রা পালার দুই একটি দৃশ্যের উদ্ধৃতি দিতে পারি।

শ্রীমতীর স্বয়ম্বর

(দ্বিতীয় দৃশ্যের শেষাংশ)

(শ্রীমতী ও সখীগণের প্রস্থান)

অম্বরীষ — শ্রীমতীর মনোভাব তো বোঝা গেল, এখন উপায় কি? পর্ব্বত আর নারদ কে ঠেকাই কি প্রকারে? দুজনেই যে অর্দ্ধাংশে শ্রীমতী সম্প্রদানের আদেশ জানিয়েছেন।

হরহরি — স্বয়ম্বর সভাতে আর কোন লোকপাল, দিকপাল, দেবতা, যক্ষ - রক্ষ গন্ধর্বকে আমন্ত্র করা তো চলে না - কিং কর্ত্তব্য তল বিবেচনা করি।

অম্বরীষ - আমিও তো কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় প্রায়। ইন্দ্র এসেছিলেন বরদান করতে তাঁকেও প্রত্যাখ্যান করেছি বিষ্ণুর ভরসায়। - - - -

- - - (উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(নারদ ও পর্ব্বতের প্রবেশ)

নারদ - ও: পর্ব্বত। উত্তুঙ্গ পথে যাতায়াত বশৎ নিঃশ্বাসা: প্রচুরী ভবন্তি, এই শিলাতলে উপবেশামি। ও: দৃষ্টি চলছে না। প্রদোষে একেই তো -

ক্ষিতঃ পন্থা তার উপরে অতিরিক্ত মধুপানে দৃষ্টি জাড্যমুপৈতি । আর কত দূরে তুঙ্গভদ্রা ?

পর্ব্বত - ঐ তো দেখা যায় - পশ্যং যে প্রাসাদ শিখরং - যাত্রাপথের শেষে শীতকিরণ মৌক্তিক মালার ন্যায় যেন আকাশ হ'তে খসে গিরি শিখরে একটি কমলের উপরে শয়ান রয়েছে ।

নারদ - এ যে একেবারে উত্তর মেঘের মধ্যে এনে ফেললে দেখি । এক কালে রায়গিরি আর অলকাপুরীর ছোট সংস্করণ চন্দ্রমণি শিলা আর সোনার ইঁটে গেঁথে তুলেছ । কিন্তু একটি অধিকারিণী বিনা সব শূন্য বোধ হয় - - - -

পর্ব্বত - নাই কি বল ? অভ্রলিহ প্রাসাদ চিত্র - বিচিত্র হর্ম্ম্যতল , নিত্যভাস্বৎ কলাপ ভবনশিখীর অনুরূপ পরিচারিণীগণ কুন্দবদনী কৌমুদী প্রভৃতয় : ইন্দ্রনীলমণি রচিত স্বর্ণকদলী গৃহ - - - - -

নারদ — আর কি বল ? শুধু একটি তন্বীশ্যামা শিখরদশনা পক্ক বিম্বাধরোষ্ঠীর অভাব এই না - ? আমি শীতে জর্জ্জর হচ্ছি মধুপান সত্ত্বেও , বিদায় দাও , এখান থেকেই মর্ত্যলোকের দিকে নেমে পড়ি ।

পর্ব্বত - তুঙ্গভদ্রায় শীতের ভয় নাই । - - - - যাবার এত ত্বরা কি ?

নারদ - ত্বরা তোমারও করা প্রয়োজন । অম্বরীষের আশ্রমে সময়ে উপস্থিত হওয়া চাইতো ।

পর্ব্বত - অম্বরীষ তো শ্রীমতী সম্প্রদানে মতই করেছে - সেজন্যে ব্যস্ততার কারণ কি ?

নারদ - বোঝ না বোঝ না , ইন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি কিম্বা আমাদের প্রভু নারায়ণটি যদি একবার

খবর পান তো সব পন্ড ।- মতগুপ্তি তার তুরা দুই চাবশাক । বিলম্বেক কার্যহানি স্যাৎ ।

পর্ব্বত - আমি তো বলি বিলম্বে কার্যসিদ্ধি ।

নারদ - তবে তুমিযতক্ষণ পার - বিলম্ব কর আমি চললেম অগ্রসর হ'য়ে ।

পর্ব্বত - তোমাকেও বিলম্ব করতে হবে - - - - - -।অগ্রসর হ'তে দিচ্ছিনে একপাত্র তুঁইভদ্রা ছেড়ে আমাকে এড়িয়ে ।

নারদ - আমি কি তোমার বন্দী ? অতিথি নয় ?

পর্ব্বত - যা ভেবে নাও

নারদ - তুমি দেখেছ শ্রীমতীকে ?

পর্ব্বত - দেখেছি - - - - - - - - - তুমি দেখেছ ?

নারদ — দেখেছি ··(গীত)

ও সে কমলা ফুলের বনের রাণী

শ্যামল কমল পত্রে লিখা ।

- - - - - - - - - - - - - -

নারদ - এই কথা শ্রীমতীর আশা পরিত্যাগ কর ।

পর্ব্বত - মায় বিরমতু , থাম , থাম ও কথাই নয় ।

(অবধূতের প্রবেশ)

অবধূত - হরহরি হরিবোল হরিবোল হরহরি হরহরি ।

(গীত)

বড় গোল বেধেছে ,

গাছে একটি বেল পেকেছে

দুটো কাকে ঝগটাপটি তাই লেগেছে

দুই দুষ্মন্ত একটি শকুন্তলা, ----

নারদ কোথায় ?

পর্ব্বত - কন্তয় ?

অবধূত - অবধূত বা অদভুত যাই বল

নারদ - চলেছ কুত্র ?
পর্ব্বত - আশ্চর্য্য বা- কোথা থেকে ?
নারদ - কুৎহি কীদৃশ ব্যাপার ?

অবধূত — তুমি আমার ঠাউরেছো কি হে ? রাজরাজড়া নিয়ে কথা - বললেই প্রকাশ করবো ?

তুমি কোথাকার কে ? কে জানে তা। চেহারা তো দেখছি গোলগুঁলের প্রায়।

(তৃতীয় দৃশ্যের শেষাংশ)

(অবধূতের সহচরগণ - নারদ ও পর্ব্বতকে ভূতের মার দিয়েছে।---

পর্ব্বত — (গীত)

চাচা জানটারে বাঁচা -

সোজাসুজি চম্পট দিয়ে --

হাঁটা পথে প্রাণ বাঁচিয়ে,

দৌড় দাও না চোঁচা ॥

শ্রীমতীর কথা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। গোপনে সম্প্রদানের আশা নেই। দেবতারা বুঝেছেন

বোধ হচ্ছে। ------

(নারদ -পর্ব্বত উভয়ের গীত)

ডান পা চলুক বাম পা রহুক

বাম পা চলুক রহুক ডান

বুঝি সুঝি চল গুটি গুটি চল

এই খান হতে সেই খান ।

দেহটা গেছে একেবারে লোহাচুর ঠাসা তুবড়ি এককালে ।

(উভয়ের প্রস্থান ইতি তৃতীয় দৃশ্য)

চতুর্থ দৃশ্য -

(ঐরাবত ও গরুড়ের প্রবেশ , গরুড়ের ছোলা ভক্ষণ গীত)

হরি হে তোমার পোষা পাখি

বল আর কতকাল তোলা ছোলা

খাওয়াইয়ে দেবে ফাঁকি ? - - - - -

ও হে ঐরাবত বিষমোলে নাকি ? আরতো ভাই ছোলা কলা খেয়ে প্রাণ বাঁচে না ।

একটা গজ কচ্ছপের যুদ্ধ বাঁধে তো বাঁচি । - - - - - - (গরুড় ও ঐরাবতের

কথোপকথন — রাম অবতারের আভাস)

(বিশ্বকর্ম্মার প্রবেশ ও গীত)

বল রাম রাম রাম প্রাণারাম

রাম প্রাণারাম প্রাণারাম রাম । - - - - - - - -

এবারে রামাবতার হবে তারই উদ্যোগ হচ্ছে , দেখছ না, নর বানরের মুখোশ । - - -

(প্রস্থান)

(পর্ব্বত মুনির প্রবেশ)

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ - - - - - ইত্যাদি পর্ব্বত - -

পর্ব্বত — — রাম রাম চলে যান ভিতরে ।

(পর্ব্বতের প্রস্থান ও নারদের প্রবেশ)

- -

(ঘন্টাধ্বনি নেপথ্যে । পর্ব্বত ও বিশ্বকর্ম্মার প্রবেশ) -

বিশ্ব - - দেখহে পর্ব্বত, শ্রীমতীকে তুমি নিজের জন্যে চেয়ে বসলে, এতো অন্যায় হ'ল, এতে করে দেবকার্য্যে ব্যাঘাত হবে । এবারে অংশাবতার লক্ষ্মীর অংশ শ্রীমতীকে সীতা করার কথা । এখন কি করা হয় ? যাক সে কথা, যা করেছ তার চারা নেই — এখন কি চাও বল ?

- -

হরহরি - ওগো হবে । সাতকাণ্ডে সবাই সাজবে আমি বাদ যাবো - এ হবে না। তাহলে বাল্মীকির রামায়ণ আমি চলতেই দেবোনা । আমার গণেশ আছেন তাঁকে দিয়ে আমি লেখাবো রাম - যাত্রা তুমি একটা মুখোশ রাখবে আমার বীরভদ্রের গোছের । রাবণ বধে আমি নামছি বাল্মীকি লিখুন আর নাই - লিখুন । চল একবার দেখিগে সাজঘরটা ঘুরে । সুদর্শন ,তুমি যাও, সুধর্ম্মা–সভাতে শ্রীমতী স্বয়ম্বরের আয়োজন কর । আমি সম্বাদ পাঠালেই উপস্থিত হতে হবে নারায়ণকে নিয়ে । একেবারে নটবর বেশ চাই বুঝলে । সুদর্শন , মা লক্ষ্মীকে বল গা আমি চাই বিষ্ণুকে শ্রীমতী বরণ করেন ; না হ'লে সীতাহরণ পালাই বাদ পড়বে , রাবণ বধও হবে না, কিচকিন্ধ্যা কাণ্ডও

ব্যর্থ। যাও বিলম্ব কোরো না।''

(সুদর্শনের প্রস্থান)''[৪]

শ্রীমন্তীর স্বয়ংবর পালার এই আংশিক উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় যে মূল কাহিনীর মধ্যে কিছুটা অসংলগ্ন ভাবে, রামলীলা কাহিনীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং এটি যে লেখকের ইচ্ছানুযায়ী সেটি সহজেই অনুমান করা যায়।

অবনীন্দ্রনাথের 'রেণি -ডে' নামে একটি গল্পে কাহিনীর পটভূমি উত্তোলিত হয়েছে' উদভুটির চরে' — সম্ভবতঃ ঐ শব্দের ধ্বনিসাম্যে অবনীন্দ্রনাথ' চর্ভটি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন -' উদ্ভট' অর্থে। এই চর্ভটি শ্রেণীর অন্তর্গত করে রচনা করেছেন তাঁর প্রথম নাটক' শিবসদাগর'। প্রথম দিকের নাটকে অবনীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের ভাবশিষ্য। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা - তত্ত্ব অবনীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল, সেই তত্ত্বই নানা ভাবে তিনি নাটকের মধ্যে দিয়ে বলতে চেয়েছেন। ফাল্গুনী, শারদোৎসব, অচলায়তন প্রভৃতির প্রভাবও অবনীন্দ্রনাথের নাটকে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের' তোতাকাহিনীর' মূলভাব রূপান্তরিত হয়েছে ধরা পড়া নাটকে। সহজাত, স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান ও শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা এবং বাঁধাধরা - শেখানো বুলির প্রতি অবজ্ঞাই এই নাটকের মূল ভাববস্তু। আর একটি' চর্ভটি' বা উদ্ভট নাটক' রাস' বারী'। অতিরিক্ত সাংসারিক বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের সোনার প্রতি যে, মোহ - তার প্রতি ব্যঙ্গ করে রচিত' রাজধারী' নাটক। নানা উদ্ভট ঘটনার সমাবেশে এটি' চর্ভটি' নামের যোগ্য।

কথামালার বিষয়বস্তু নিয়ে যে সমস্ত দৃশ্য সংলাপ রচনা করেছেন বিষয় বস্তুর দিক দিয়ে সেগুলি অকিঞ্চিৎকর। যেমন' ফক্কান পালা' বৃক ও মেষপালা বুলু - নীল শৃগালের

৪। অবনীন্দ্রনাথ — 'শ্রীমন্তীর স্বয়ংবর' — শারদীয়া দেশ - ১৩৬৮, পৃঃ - ৩২ - ৩৭

কথা , দুই পথিক ও ভল্লুকের পালা ইত্যাদি । এগুলির অভিনবত্ব হচ্ছে নূতন কয়েকটি পশুপক্ষীর চরিত্র সৃষ্টি এবং গান, ছড়া ও নাচের সাহায্যে কয়েকটি দৃশ্য রচনা । এগুলি পাঠে যতটা না রস অনুভব করা যায় , নিছক আনন্দের , কৌতুকের মনোভাব নিয়ে অভিনয় করলে তবেই দৃশ্য এবং আস্বাদনীয় হয় । রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর বহু কাব্য কাহিনীকে গীতিনাট্যে রূপান্তরিত করেছিলেন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য রূপে আস্বাদনের জন্যে - অবনীন্দ্র নাথ ও শিশুদের জন্যে - কথামালার রাজ্যে নাচ গান ছড়ার অবতারণা করে তাকে দৃশ্য করে তুলতে চেষ্টা করেছেন । নিছক আনন্দ পরিবেশন ছাড়া নীতিশিক্ষা দানের কোন উদ্দেশ্য নেই ।' ফমকান পালা' আঙুর ফল ও শৃগালের গল্প , - এর আংশিক উদ্ধৃতি আমাদের মন্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত করবে - - - -

- ফমকান পালা -

(আঙুর লতা ও আঙুর পাতার গীত)

আঙুরপাতা - হ্যাদে ও আঙুর লতা -

এতকাল ছিলি কোথা ?

লতা - এতকাল ছিলেম বনে

আপন মনে একটি কোণে

পাতা - বনে যে শ্যালটা এলো -

পালায়ে আসতে হ'লো -

বলি ও আঙুর পাতা -

তুমি এতকাল ছিলে কোথা ?

লতা - ছিলেন আমি সেই খানে

কাবুলের গুলবাগানে ।-

- - - - - - - - - - - -

সেখানে যে ভালুক এলো -

পাতা - তারি তাড়ায় পালাতে হ' লো ।

উভয়ে - এইখানে এক বাগান আছে

সেই খানে এক আঙুর গাছে

নেশা করা ফল ধরেছে ।

উভয়ে - পাতে পাতে মাচার ছাতে ।

পাহারা ফেরে কটা কাবুলী -

ঢিলে পাজামা হাতে বোলাঝুলি

গোলাপ বাগেতে রবব বাজায় -

আঙুর বাগেতে ভালুক নাচে ।

ওই যে আসে, ওই যে আসে

তাথা তাথা বোলা হাতা ।

(কাবুলীওয়ালার প্রবেশ)

গীত

পেশাওর সে আতা হুঁ আয়েস চয়েন মেরা কাম ..... ইত্যাদি ।

সকলে নৃত্যগীত

আঙুর খরবুজ আলুবখরা

কাবুল কসমীর মক্কট হাল্‌ব্রা

খিসমিস্‌খিসমিস্‌ আখরোট পিস্তা

গুর্জিন পুসতিন জাফেরান হোর হিং

খস্‌ খস্‌ ইশুর বেহেস্তের খোরমা । - - - -

(শ্যাল ব্লু নীল ও হুক্কা - বরদার হুক্কা শেয়ালের প্রবেশ)

ব্লু নীলের গজল

আঙুর পাতার খঞ্জুরেতে দিল্‌খানা মোর চাক করিল

পারা পারা হ'য়ে গেছি কি প্রকারে বাঁচি বল । ....

হুক্কাবরদারের গীত

আঙুর নজুরি তম্বাখু ছিলিম মেরী

লিজিয়ে হুজুর পিজিয়ে

আজব চিজ তম্বাখু দমকি সুধারে । - - - - - -

(ভুঁড়ো, বুড়ো ও আলটপকা শেয়ালের প্রবেশ)

ব্লু-নীল - এস, এস, এস, এস, - - - - ভায়া দুই জন

কহ - কহ আলটপকা কিবা প্রয়োজন , - - - -

বুড়ো - - ভাই - হে বুড়ো বয়সে উপসে উপসে

শটে, কিছু কাহিল হুয়া । - - - -

ভুঁড়ো - - প্রচণ্ড শীতের ধূপ বড় তেজস্কার

পেয়াসের জোরে প্রাণ করে হাহাকার ।

আলটপকা - দাহদাহা করে অঙ্গ জ্বলে সর্ব্বক্ষণ

বাঁচন হইতে এবে মঙ্গল মরণ । - - - - - - -

নিলু - বাহবা বাহবা মাৎ করে হওয়া

ভুঁড়ো - আহা রে আহা হা' হারে হাঃ হাঃ ।

বুড়ো - না পিয়ে ধরে না যায় পাওয়া ।

সকলে - হয় না পাওয়া , হয় না খাওয়া ।

আ : হারে আহা ।

আলটপকা - - নাগাল না পাই দুলছে খালি

নাকের ডগায় গাতার জালি । - - - -

আঙুর ঝারি ধরতে পড়ি -

গুমরে মরি ঘাড় দেবনায় ।-

সকলে - আহারে আহা বা : হারে বাহা -

ঐ ক্যা হুয়া ই ক্যা হুয়া ——

আলটপকা - এক পল চার ঘড়ি বাকি সাম হইতে

আসিবেক বাগোয়ান নেঘাবানি করিতে

চৌকিদার সহিতে । - - - - -

সকলে - - আস আস নিলু বুলু -

বুড়ো ভুঁড়ো ঢুলু ঢুলু - - - - -

(লম্ফ ঝম্প গীত ও জগ ঝম্প বাদ্য)

আলটপকা - লাফালাফ লাফালাফ

ঝাপাঝাপ থপাথপ -

টপাটপ্ তোলো হাত ।-

নিলু - এই এক লাফ - এক হাত -

দুই লাফ দুই হাতা - - - -

বুড়ো - ছেঁড়ো পাতা হুপ্ হাপ্ মারি লাফ

মাটি ছাড়া ওরে বাপ্ - - - -

ভুঁড়ো - হঠাৎ কুপোকাৎ -

হা : হা : পায়ে বাত -

সব আমি পাড়ি বাঁপ ।

(ভুঁড়োর গীত নৃত্য)

এই লো জম্প এই হ্লো জম্প

স্ট্রেট জম্প সাইড জম্প - - -

(শ্যাল ব্লু - নীলের গীত)

হুক্কা বরদার হুক্কাটা ভর

আলটপকা এয়েছে ঘুর ! - - - - - - -

(রামছাগলের প্রবেশ)

রামছাগল - ভাই তোমার দুই নয়ানে জলধারা দেখি কেন কি হল কি হল কিবা হল

বন বন ছল আঁখি কেন ? -

শ্যাল ব্লু নীল - দুখের কথা কইবো কি তোকে -

আমার বড় সাধের আঙুর লতা -

ফলকটা তার গেছে টকে । - - - -

আলটপকা - আমার মনে রইল বড় খেদ

ভেবে নিশে দিবে হৃদি হল ভেদ ।

ছিল বহু আকিঞ্চন

আঙুর রসেরি সিঞ্চন , - - - -

বুড়ো ভুঁড়ো - - হায় কাহার ফলন্ত গাছ ফেলিয়ম তুলি ,

কাহার মধুর কলসী করিলাম চুরি

দ্রাক্ষাগাছে খাটা হ'ল দেখি বুড়ি বুড়ি ।

সকলে - বনে ধরবে এবার তেঁতুল গাছে পেয়ারাগুলি ।

রাম ছাগল - মধু তিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রে -

কে বলেছে মিটি বৃক্ষাগ্রে -

জেনে রাখ ভাই সর্ব্বাগ্রে - -

মধু মক্ষিকার সাচ্চা বুলি - - - - - -

সকলে - - বন্ধি তে চল রাস্তা দে -

ভেস্তে যাওয়া ফল হাতে । - - -

(ছাগলের গীত)

শয়ে রি ফলা ওহে শৃগাল ভাই রে ভাই

তাইরে নাইরে তাইরে নাই -

নাপাই বাঁপাই । - - - - - -

(শৃগালের শেষ নৃত্যগীত)

চল আজু বাজু ঠ্যাংউ ঠাজু

লেজু লেজু ল্যাজ গুড়াজু

চোঁচা চু - চু হঃ হা হুঃ হু উঃ হু

এচু ভেচু লেচু লেচু -

ন্যাজ গুড়াজু ঠ্যাঙউ ঠাকু

খেজু খেজু

গ্রেপছার সউতার -

চেখে দেখে খেজু ।-"[৫]

এগুলোকে চলন্ত ছবি বলে মনে কার যেতে পারে — যেগুলো সুর ও ছড়ার দ্বারা কল্পনাকে টেনে নিয়ে যেতে পারে অসম্ভবের রাজত্বে অদ্ভুত ও উদ্ভটের সমাবেশ , সেখানে অসঙ্গত বলে মনে মনে হয় না । অবনীন্দ্রনাথের যে মন'' এই আছি চোখে দেখা জগৎ থেকে এই মনে ভাবা কল্পনা রাজ্যে চলে যায়' সেই মনের সন্ধান এই যাত্রা পালা গুলোতে । - যেমন - - -

ভুতপতরীর যাত্রা -

মূল গায়ন দিশা - (চালতাতলার মাট)

৫। অবনীন্দ্রনাথ — 'মসকান পালা' — জয়মাল্য (বার্ষিকী - ১৩৬৩) - পৃঃ-২৬

সিঁদুর বরণ মেঘ বিন্দু বিন্দু বর্ষে পানি

বনচালতায় রঙধরায়

দুধ আলতায় একটুখানি ।

ডাল বেয়ে ওঠে লাল পিঁপড়া

গান পাড়ে উই চিংড়া

কি তার গলা খাঁকানি - -

(উইচিংড়ির নৃত্যগীত)

ছি ছি ছি চি

মেজপিসি সেজপিসি

ডেভে পিমড়ে দিয়ে চিমটে -

পিচি পিচি তেঁতুলে বিছে দিলে খিমচে -

গীন - (কোলা ব্যাঙের আথর পাথর নৃত্য)

এরে চালতাতলায় হাঁটু পানি

ঝিঁঝিঁর মায়ের কানফোড়ানি -

জীজীমায়ের কি লাফানি ।-

- -

(ঝিঁ ঝিঁ পোকাদের জিক্কির নৃত্য -

মঞ্জির জিঞ্জির খঞ্জরি টিং টিং

রিপিটিং রিপিটিং

ক্রিং ইং ক্রীং ইং দিন দিন খ্রি ঝিলিং

(ঝিঁ ঝিঁর নৃত্য)

ঝিনঝার সর্দ্দার ঝনঝার ঝাঙ্কার

পাঞ্জার কাশ্মীর নির্জ্জন কান্তার -

ঝিঁঝার ঝিনিক রিনিক রিনিক্

ঝিরঝির ঝিকমিক চিকমিক ঝিনঝার ।

(অবুর প্রবেশ)

অবু - গেছি গেছি গেছে কান — এযে শব্দের

টর্নেডো রহমান — নিচয় মাসি ধরেছেন

হাতি ঘুমপাড়ানি গান । সুরের কাঁচি চালাচ্ছেন পিসি কচাং কচাং । কে জানে

একোথায় এলাম । ওকি বলে ? জিরোও জিরোও শব্দ শব্দ সব অন্তর্ধান ।

(মূল গায়ন ও জুড়ি দোহার গীত ।

আচ মিতে থামিল ঝিল্লির রব

নিস্পন্দ হইল বায়ু যেন কি করিয়া অনুভব ।

জুড়ি - - হঠাৎ কুহুরাতে নামিল বনে

থমথমে চারিদিক ভয় জাগায় পথিকের মনে ।

নিবিড় অটবীতে - প্রদীপ জ্বালি দিতে

জোনাকিরা ব্যস্ত হয় তরুশিরে পুষ্পবনে ।

দোহার - নিঃসাড়ায় ডানা মেলায় কাল পেচক

কোকিল ডাবিছে দিবে কিনা কুহুরব ।

অবু - কেও বললে কি ? বোঝা গেছে উপদ্রব বেড়েছে । পেটটা কেমন টেনে ধরল যে । একটা চালতা গাছ দেখি যে ।

চালতার রস বড় তেজস্কর

মহৌষধ পেইন কিলার - - - -

বলেছে কবরেজ চালতা দেয় বিশেষ উপকার কাঁচা পেড়ে নেওয়া যাক্ - - -

গণ্ডা দুই দুচ্চার ।

(গীত নৃত্য - অবুর)

পাকা চালতা দুটো খেয়ে নেওয়া চাই

কাঁচা পাকা দুটো বা হাতে রাখা চাই ।

কি জানি পিসির বাড়ী গুড় অমুল দুই দমুল

পাই কি না পাই । - - - -

॥ অবুর লক্ষবাম্প ॥

এই এক লাফ — গুড় অমুল -

দুই লাফ - দই দমুল

তিন লাফ — দিনের খোরাক হ'ল সমুল । - - - -

(রালতা পাখীদের নৃত্যগীত - পার্চমেন্টাল ব্যান্ড)

কি পেলো ?   কি পেলো ?

গাছ চেপে কে পেলো দুম দদ্দড় ।

----- ----------

অবু -   আরে বাবা চালতা চেপে অবুনাথ পেলো

অবুনাথকে চেপে চালতাগাছ পেলো

ধড় ধড় ধড়াস ধপাৎ পেলো -

-- হে দরদী এখন ধরে তোলো ।

''জুড়ি দোহার গীত"

ধরে তোলো হে দরদী -   পড়েছি বিপাকেতে ---

(ব্যাণ্ডবাদ্য)

বিপদি ধৈর্য্যং

ধৈর্য্যং কুরু ধৈর্য্যং কুরু ধৈর্য্যং

আপদং কথিতং ....

অবু - এযে সশব্দে গুড়ুনি গুড়ুনি বৃষ্টি হল শুরু

(চালতাবুড়ি - আলতাবুড়ির প্রবেশ)

১। টিপির টিপির বৃষ্টি পড়ে - চালতাতলায় কে ?

অবু --   আর কে অবুনাথ আচার খেয়েছে -

পড়ে পড়ে পটল তুলতেছে ।

২।   এই মেরেছে চালতা পেড়েছে -

অবু — পেড়েছে তো পেড়েছে যত পেরেছে পেড়েছে

যত পেরেছে খেয়েছে — তোরা বলবার কে ? - - -

(অবুর চলন বলন গীত)

অঙ্কু বাঙ্কু খেঙ্কু খেঙ্কু চালতা গাছ, তুমি খাও বড় বাপট ।

আমি চিরাই চালতাপাত ।

পালটা আর চালতাতলায় আসতেন না অবুনাথ

চালতাবুড়ি আলতাবুড়ি প্রণিপাত ।

(মোরপঙ্খ মারাঠীর প্রবেশ)

অবু — কে ও তুমি আবার কে পাত যাত ?

মুখে চিত্রিবিচিত্রি লেখা মাথাতে ময়ূরের পাখা ?

বাঁ হাতে কেয়াপাতার করাতে - - - ?

মোর - মোর পঙ্খ মারাঠি - দাও মুণ্ডু কাটি ।

অবু — আমি তো শিশুবোধের বৃষকেতু নয় যে

বললেই দেবে মুণ্ডু কাটি । - - - - - - -

অবু — কার মুণ্ডু কটি দিতে হবে কও বাপু তাই দি -

মোর — গৌড়ের ।

অবু - গৌড়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি ?

মোর — তুমি তো গৌড়ের লোক ।

অবু - আমি গৌড়ের নয়, উড়েরও নয়, আমি

যে সে লোক নই - - হ্যাঁ । - - - - - - -

- - - - - উদ্ধব যা বলেছিল কিছু কিছু লাগছে উপদ্রবের ঢেউ । যাক এখনকার

মত টুকন বাক্সটা সরে পড়ি সেরে চালতাতলার হাট ।

'' ঝিঁঝির বাদ্যগীত — অবুর উত্তর ॥

চললে বাঁটি চললে বাঁচি - -

আরে বাবু চলতেই - তো আছি ।

চললে বাঁচি চললে বাঁচি - -

কেন কাটো আর কানে থামচি,

চললে পরে আমিও বাঁচি । - - - -

(পাল্কীর প্রবেশ)

॥ অবু ও বেহারাদের গীত ॥

জুড়ি ও বেহারা - - হেই বাবুজী চইলে চল

চালতা তলায় ঝামেলা বড় - - - -

দোহার ও অবু — চলবকেন ? চলব কেন ?

পাল্কি আন ঘরটি যেন - - - - - - - - - - -

জুড়ি ও বেহারা — হেই বাবুজী তাকায়ে দেহ

ভুঁই ফোঁড় ওটা কেও ?

তাকায়ে আছ কটমট ?

অবু — ওরে পাল্কিতে ধরে ওঠা চটপট —

কই নাই কেউ, কোথায় বা কি

যেখানের সেখানেই আছি —

খালি শব্দই পাচ্ছি, হুমপা হুম

চলেছে পালিক ।-

॥ অবুর গীত ॥

ও অবুনাথ আলোটা জ্বাল -

মাঠঘাটের গতিক ঠেকেছে না ভাল - - - - - - - - - -

(ঝিঁ ঝিঁ ঝিম বাদ্য)

মনজিল মনজিল চলে চল ভাই - - - - ইত্যাদি -

(ইতি চালতাতলার ঘাট) ।[৬]

অবনীন্দ্র নাথের যাত্রাপালার বিষয়বস্তুর আর একটি অংশ পৌরাণিক কাহিনী মূলক, রামায়ণ মহাভারতের প্রচলিত কাহিনী উপজীব্য । শ্রীমতীর স্বয়ম্বর, জাবালির পালা, দু সহপালা, ঋষিযাত্রা, পুতনীর পালা, হংসনামা পালা প্রভৃতি এই জাতীয় রচনা । পৌরাণিক কাহিনীকে পরিহাসের লেখনীতে উপস্থিত করায় অবনীন্দ্রনাথ — রাজশেখর বসুর পরিপূরক । অনেক ক্ষেত্রেই পৌরাণিক চরিত্র — মানুষ এবং মনুষ্যেতর প্রাণী অবনীন্দ্র - নাথের লেখনীতে তরলীকৃত তবে ব্যঙ্গের খোঁচা কোথাও নেই সূক্ষ্ম বেদনাও নয়, বিশুদ্ধ পরিহাস এবং কৌতুক ছাড়া এর অন্য কোন উদ্দেশ্য পাওয়া যায় না । জাবালির পালায়

৬। অবনীন্দ্রনাথ — 'ভূতপতরীর-যাত্রা-' — লম্বকর্ণ-পালা — (নাটক-সংকলন - ১৩৬৮) পৃ:- ৫৮

জাবালি অপ্সরা ঘৃতাচীকে বলে - -

জাবালি – সুন্দরী কিছু মনে কোন না, তুমি নিতান্ত খুকীটি নও। তোমার মুখের লোধ্ররেণু ভেদ করে ওকি বলি রেখা দেখা যাইতেছে ? তোমার চোখের কোলে ও কিসের অন্ধকার ? তোমার দন্তপংক্তিতে ও কিসের ফাঁক ? - -

ঘৃতাকী – সকাল হোক, দুধ সর ঘৃতাদি উর্বটন মাখি, স্নান করি উষ্ণ জলে মুখে দিই হিমানি -

সখী - তখন দেখো মুন্ডু ঘুরে যাবে।-

(বাঁটা হাতে হিন্দ্রালিনীর প্রবেশ, ঘৃতাকী ও সখীগণ কে প্রহার)

হিন্দ্রা - দশাননে, নির্লজ্জে, খেঁচি, তোর তো - আস্পর্ধা কম নয়। বোকা পেয়ে আমার স্বামীকে ভোলাতে এসেছ। পাঠাচ্ছি তোকে বারাণসী[৭]।"

হিন্দ্রালিনীর এ' হেন আচরণকে সমর্থন করা – অবনীন্দ্র নাথের লেখনীতেই সম্ভব।-

রামায়ণের মূলকাহিনী নিয়ে তিনি 'খুদ্দুর যাত্রা' (১৯৩৫ – ৩৬) নামে একটি যাত্রা পালা রচনা করেন – পান্ডু লিপির প্রথমেই মঙ্গলাচরণ সরস্বতী প্রণাম, ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তিনি সংস্কৃত নাট্যরীতি অনুসরণ করেছেন। -" শ্রীশ্রী সরস্বতী প্রণাম - - -

অগ্রে ভারতীকে জানাই প্রণাম - আদম নিগম যিনি ভারতপুরাণ।

মা সরস্বতী হও কৃপাবতী, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অতি

নিধিরাম খুদিরাম কেনারাম বেচারাম প্রতি

৭। অবনীন্দ্রনাথ – 'জোবালির পালা' – শারদীয়া দেশ – ১৩৬১, পৃঃ – ২২

তাই কাতরে অতি শরণ নিলাম,

খুদ্দুর এ যাত্রায় কর মা পরিত্রাণ''।—

''গীত জুড়ি দোহার বালকগণ''— ''আসর বন্দনাগীত নৃত্য''

''খুদে গণেশের''

খুদ্দুর আমাদের খুদ্দুর যাত্রা

ধেরে কেটে ধা তেরে কেটে তা

গোড়ার আপদ কাটান বিঘ্ন নাশ কর্ত্তা।''[৮]

বলাবাহুল্য এই খুদ্দুর যাত্রা —''বালকবালিকাগণের জন্য লিখিত''। —

বেচারাম, কেনারাম, নিধিরাম সংস্কৃত নাটকের সূত্রধারের কাজ করেছে। উপরন্তু যাত্রায় যেমন অধিকারী থেকে আরম্ভ করে মূল চরিত্র, নারীচরিত্র, পার্শ্বচরিত্র সকলেরই নৃত্যগীত বাদ্যের অধিকার থাকে — এই যাত্রায় ও সেই নৃত্যগীত বাদ্যের বাহুল্য দেখা যায়।— এই নাটকাকারে গ্রথিত যাত্রা পালায় তিনি মূল বাল্মীকি রামায়ণ অনুসরণ করেছেন এবং কৃত্তিবাসও অবলম্বন করেছেন ...

নান্দীপাঠ -- ''বাল্মীকী বন্দিয়া বন্দি কৃত্তিবাস বিচক্ষণ সরল ভাষায় লিখেন

যিনি সাত কাণ্ড রামায়ণ, যাত্রাকারে খুদিরাম রামলীলা করিলাম বিস্তার

বেচারাম কেনারাম দুখু নিলেন বেচারাম ভার। সর্ব্ব সত্য সংরক্ষিত নিধিরাম

পর্য্যার অলমতি বিস্তরেণ বিলম্বেব কি চার্য্য আর।''[৯] অবনীন্দ্রনাথ রামায়ণের

সংক্ষেপ - [illegible] যথাযথ অনুসরণ করেছেন —(১)

৮। অবনীন্দ্রনাথ — খুদ্দুর যাত্রা - অপ্রকাশিত - পাণ্ডুলিপি, পৃঃ ৯
৯। " " " " পৃঃ-২

(১) আদিকান্ড - রামজন্ম , হনুমানের জন্ম ইত্যাদি বিবরণ (২) বালাকান্ড সীতার স্বয়ম্বর , তাড়কানিধন , রামসীতার বিবাহ । (ক) অথ অযোধ্যাকান্ড –'' নিধিরাম কোথারাম রাজা হবেন কোথা যান বন এইখানে অযোধ্যাকান্ড করিনু সমাপন ।(খ) অরণ্যকান্ড – ভরতবিদায় - চিত্রকূট পর্ব্বত , সীতাহরণ ইত্যাদি ।

(৪) কিষ্কিন্ধ্যা কান্ড – কবন্ধ উদ্ধার , সুগ্রীব সখ্যতা , বালিবধ ইত্যাদি ।

(৫) সুন্দরকান্ড - সমুদ্রলঙ্ঘন (খ) ইন্দ্রজিৎ বধ , শক্তি শেল পর্য্যন্ত , (গ) রাবণ বধ । লঙ্কাকান্ডের শেষে রামসীতার আবির্ভাব ও অযোধ্যাপতন ।-

(৭) উত্তরকান্ড – সীতার বনবাস , শেষে বাল্মিকীর আবির্ভাব -'সীতার লাগিয়া রাম'

নাহি কান্দ লোকে ,

সীতা মনে দরশন নাহি হই লোকে ,

বৈকুন্ঠে লক্ষ্মীর সঙ্গে হবে সম্ভাষণ -

চল এবে নিত্যকৃত্য করি সমাপন ।

নবকুশে লয়ে সভাতে শুনাবো রামায়ণ ।''[১০] এটি ছাড়া অবনীন্দ্রনাথ আরও একটি যাত্রাপালে রামায়ণ' রচনা করেছেন - সেটি অধুনা প্রকাশিত , (জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬) – এটির অভিনবত্ব হচ্ছে ভূমিকা অংশে রাবণের তপস্যা ও ত্রিলোক বিজয়ের কাহিনী - রামায়ণে যেটি উত্তর - কান্ডে বর্ণিত লেখক এখানে নাটকের স্বার্থে প্রস্তাবনা অংশে যুক্ত করেছেন ।-

---

১০। অবনীন্দ্রনাথ – খুদ্দুর যাত্রা - অপ্রকাশিত পান্ডুলিপি পৃ : ২৩৫ ,

যাত্রার আঙ্গিক সম্পর্কে আলোচনা করলে দেখি যে — দেব উৎসব উপলক্ষ্যে নৃত্যগীত ও শোভাযাত্রা থেকে যাত্রার উদ্ভব হয়েছে। নৃত্য ও গীত এর দুটি প্রাথমিক উপাদান। প্রাচীন যাত্রায় সমস্ত চরিত্রের নৃত্যগীতে অংশ গ্রহণের অধিকার ছিল। দশরথ, কৈকেয়ী -রাম, রাবণ, মন্দোদরী সকলেই লোকনাট্যের আসরে নৃত্যে অংশ গ্রহণ করতেন। তবে অনিয়ন্ত্রিত বলে এ নৃত্য অনেকসময় হাস্যকর হ'ত। যাত্রার উপাদানের মধ্যে প্রধান হচ্ছে - (১) সঙ্গীত (২) অভিনেতব্য সলাপ সংযোজন (৩) কাহিনী ও ঘটনার উপস্থাপনা (৪) চরিত্র সন্নিবেশ (৫) লোকশিক্ষা (৬) রসসৃষ্টির ব্যবস্থা। ভাবাবেগ উদ্রেকের জন্যে সঙ্গীত যাত্রা নাটকের, সলাপের অপরিহার্য পরিপূরক। যাত্রার আরম্ভে একটি প্রস্তাবনা গান থাকে - এই গানের মধ্যে দিয়ে প্রস্তাবনা করা হয়। যাত্রার আর একটি অপরিহার্য অঙ্গ হচ্ছে জুড়ির গান। সমস্ত অভিনেতার পক্ষে গান গাওয়া সম্ভব নয়, কাজেই গান শ্রুতিমধুর করার জন্যে সুকণ্ঠ গায়ককে দিয়ে সঙ্গীতাংশ গান করিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা যাত্রায় প্রচলিত হয়। চরিত্রের উক্তি দিয়ে গান আরম্ভ হ'ত বলে একে উক্তি গীতিও বলা হ'ত। আর যাত্রায় রামায়ণ গানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গীত, বর্ণনামূলক ও উক্তি প্রত্যুক্তি মূলক পদ্যাংশ চরিত্রের নামোল্লেখ করে সলাপ সংযোজন, তাছাড়া বক্তৃতার মাধ্যমেও রামায়ণ গান পরিবেশিত হয়।

অবনীন্দ্রনাথ ইত্যাদি যাত্রাগানে রামায়ণ, অরণ্যকাণ্ড পালা, 'হরুমনামা পালা' ইত্যাদি পৌরাণিক কাহিনী মূলক যাত্রাগুলিতে সঙ্গীত এবং অভিনেতব্য সলাপ সংযোজন ইত্যাদি আঙ্গিক অনুসরণ করলেও মূল পার্থক্য এনেছেন রসসৃষ্টি এবং লোকশিক্ষা বিষয়ে। যাত্রাগানে আদি,

করুণ , বীর হাস্য এই কয়টি রসের বাহুল্য থাকে এবং যাত্রা একটু চড়া সুরেই বাধা হয় । মোটামুটি লোকমনোররঞ্জক স্থূলরসের দিকেই তার প্রবণতা ; অবনীন্দ্রনাথ এই কয়টি রসের মধ্যে হাস্যরসকেই প্রধান করেছেন , অন্যান্য রসগুলি গৌণ ভূমিকা অবলম্বন করেছে । আদি ও করুণের অবতারনা নেই বললেই হয় । ছড়া গান এবং নাচের সাহায্যে ও হাস্যরসের অবতারণায় লোকরঞ্জন তথা শিশুমনোরঞ্জন করাই তার মুখ্য উদ্দেশ্য । দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন , ন্যায় অন্যায়ের দ্বন্দ্ব ও অন্যায়ের পরাজয় , সতী সাধ্বীর চরিত্র মাহাত্ম্য বা পাপীর পরিবর্তন , অথবা ভগবদ্ভক্তির আধ্যাত্ম - রসে অবনীন্দ্র নাথের যাত্রা প্লাবিত নয় । একটি উদ্ধৃতি দ্বারা এটি পরিস্ফুট করা যেতে পারে - - - ঋষি যাত্রা (আংশিক উদ্ধৃতি)

পরশুরাম রচিত 'জাবালি' গল্প হইতে যাত্রায় ভাঙা)

মূল গায়েন দিশা ''

প্রথম অগ্রহায়ণ মাস দশদিক সুপ্রকাশ

রাম ছাড়েন অযোধ্যা নগর - - - -

(রাম , লক্ষ্মণ ও সীতার প্রবেশ)

" নগরবাসী গণের গীত''

বনবাসী করলে ও রাম কী দোষে তোর জনক তোরে ?

কেনরে আজ বিনা মেঘে হেন বাজ অশনি -

হানিল ওরে ?

বৃদ্ধকালে নরপতি -

নারীবশে ভ্রান্তমতি

করেছেন যে অনুমতি

- সঙ্গত তা কেমন করে,

হায় কি হোলো - শুনে প্রাণ যে কেঁদে উঠলো - ক্ষুদ্র মাতৃহত্যা করতে চাওকি পিতৃসত্য পালন করে ?

''রামের গীত''

যদি মতি থাকে পিতৃ সত্য পালনে -

ভক্তি থাকে মাতৃগণের শ্রী শ্রীচরণে

তবে সুখে রব গহন বনে

ভাই লক্ষ্মণ আর সীতার মনে''।

লক্ষ্মণের গীত -

গতি নাই ভাই - যাওয়াই চাই অরণ্যে,

বিধির নির্ব্বন্ধে - নির্ব্বাসনে দণ্ডক বনে ॥

'নগরবাসিগণের গীত ॥

রাম লক্ষ্মণ কেন যাবেন বন ?

তপোবনে লাগিয়ে বসেন তুলসী কানন,

কুঞ্জবনে কুলিয়ে বসেন রত্ন সিংহাসন --

অকারণ কেন যাবেন বন ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

রাম - পিতা অভেদ্য সত্যপাশে বন্ধ , বনবাস ব্রত গ্রহণ করে তাঁকে সত্যমুক্ত করাই তো পুত্রের কর্তব্য - - -

ঋষিগণের প্রবেশ

ভরদ্বাজ - রামচন্দ্র , চিত্রকূট বাসী ঋষিগণ তোমাকে দর্শনের নিমিত্ত আগত ।

রাম - প্রণমামি ।

ঋষিগণ —জয়স্তু , জয়স্তু ,

॥ গীত — মূল গায়েন, দোহার - তুষ্টি জুড়ি ॥

মরীচিকল্প — ওঁরা করেন মরীচ সাধন -

খানশুধু চন্দ্র কিরণ তপন তাপন ।

(গোলমরিচ আর লঙ্কা বাটন)

অংশুকুট পত্রাহরি - তৃষিকুটি খান পাতাপাতাড়ি

(তালপাতারি পুঁথি পাতাড়ি)

দাঁতে কামড়ান দন্তকুটনী -

উন্মজ্জলী অন্তর্জলী রত্ন ।-

- - - - - - - - - - - - - - -

রাম - অনুগৃহীত হলেম । স্বাগতম্ । স্বাগতম্ -

বাল্মীকি — ভো জমদগ্নি । এ দুটি সুকুমার বালকের সঙ্গে আমার সংকল্প ভ রামায়ণে বর্ণিত রামলক্ষ্মণের তো সাদৃশ্য বড় একটা দেখছি না — কেবল মেঘো সবুজ আর হরিতাল বর্ণ ছাড়া । দশ সহস্র মত্ত হস্তীর তুল্য বলশালী

দশরথের পুত্র আর দশানন হ'তাকে কেমন দুর্ব্বল ও কৃশ বোধ হচ্ছে না ?

(খর্ব্বট, খল্লাট ও খালিত জাবালির আশ্রমে)

খর্ব্বট – তুমি বৃথাস্য বচন গ্রাম্যের মধ্যেই আনো না ?

জাবালি – না কেন না , সেরূপ করলে ভোজনের ব্যাঘাত হয় । আমার আহার্য্য প্রস্তুত চলি

খালিত – নারায়ণ , তবে দেখ আমরা অভিসম্পাত করি । চন্দ্র সূর্য্য তারকা সাক্ষী দেবগণ

পিতৃগণ বসটকারগণ ,

গীত -

অষ্ট বসু অষ্ট তারা , তোমরা র'লে সাক্ষি সাক্ষি-

অষ্টদিকে , অষ্টফল আমরা এই রাখছি -

অষ্টবসু , অষ্ট তারা তোমরা র'লে সাক্ষি -

অষ্টদিকে অষ্টফুল এই আমরা রাখছি ।

জাবালির গীত -

দৌন্ডিকের সাক্ষি মদ্যপ

তস্করের সাক্ষি গ্রন্থি ছেদক -

মূর্খের সাক্ষি খন্ডক

এটি বরাবর দেখে আসছি ।

জাবালি – হে বালখিল্যগণ , বৃথা দেবতাদের আহ্বান করছ , – তাঁরা আসবেন না যতই ছড়া কাট , এবরং তোমরা জুজু , কানকাটার মা , নরুণদাঁতি , একানোড়ে প্রভৃতিকে স্মরণ করে দেখতে পার – এ নাটির কাছে তাঁরাও এগোবেন না ।

মাতু — হে আর্য্যপুত্র, তুমি কেন এই উল্পায়ু অপোগণ্ড, অকালকুষ্মাণ্ডগণের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা করছ — ওদের খেদিয়ে দাও।

জাবালি — সেই ভালো ওঁরা একখানা শূর্প চেয়েছেন। ভাঙাকুলোর বাতাস দাও তুমি সম্মার্জনী হাতে - আমি ফুঁয়ে উড়িয়ে দিই - রামা - কানু দু ভাই এস।

(লাঠি খেলা গীত)

আথা জ্বলন্তি পাথা চলন্তি

চন্দন কাঠের বন্ধন ঘরে

জীরার আগে তুঁষ পোড়ে

খড়িকার আগে ভোজন করে

প্রাণ স্বচ্ছন্দে যান স্বচ্ছন্দে,

আ রে রে রে রে রে ঠাকুর কিলাইমো

ও হেঁটো চলরে, হেঁটো চলরে পাঁচিল পার

বাপাৎ গিরাই রে, বাপাৎ করি পগার পার।

যাউচ্ছন্তি, যাউচ্ছন্তি রে রে ॥[১১]

(বালখিল্যগণকে পাঁচিল পারে নিক্ষেপ)

— উপরের উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় পৌরাণিক ঋষিদের মুখে মেয়েলি ব্রতের ছড়া এবং গীত সংযোগে অবনীন্দ্র নাথ হাস্যরসের অবতারনাই করতে চেয়েছেন।

১১। অবনীন্দ্রনাথ —ঋষিযাত্রা - শারদীয়া দেশ। (১৩৫৭) পৃ : - ১৫

সংস্কৃত নাটকে এবং যাত্রায় সূত্রধার ও অধিকারী বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ না করলেও প্রস্তাবনা তাদের উপস্থিতি অপরিহার্য্য। অবনীন্দ্রনাথের অনেকগুলি যাত্রাপালায় এই অধিকারী সূত্রধারের ভূমিকা ছাড়াও অভিনেতব্য চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেছে। অন্যান্য যাত্রা থেকে এই খানে তিনি কিছুটা পৃথক আঙ্গিকে চলে এসেছেন। যেমন - -

(যাত্রার মধ্যাংশে) (অধিকারী, তুড়ি জুড়ির প্রবেশ) -

অধিকারী — ওহে তুড়ি জুড়ি এইবার তোমরা এস। সহজ ভাষায় অর্থ্যাৎ কর - লক্ষ্মীছাড়া দশাই বা কেমন, লক্ষ্মীমন্ত দশাই বা কেমন। প্রথমে কও দুঃখের কথা, পরে সুখের।

॥ জুড়ির গীত ॥

লক্ষ্মী তুমি দুঃখ দাও যে জনারে
তার কেউ দেখে না সুখ ব্রহ্মাণ্ড বৈমুখ
দুঃখের উপরেদুখ -
সুখ নাহি রয় ত্রি - সংসারে। - - - - ইত্যাদি -

॥ তুড়ির গীত ॥

লক্ষ্মী তোমার পড়ে যবে দৃষ্টি
ছতরী ফুঁড়ে তার ঘরে সোনা বিষ্টি
সদয় চাহনি রয় যার প্রতি
মিষ্ট ভাষী বলে হয় তার খ্যাতি। - - - - ইত্যাদি

॥ গণেশের প্রবেশ ও গীত ॥

টক্কা দেবী কর যদি কৃপা -

না রহে কোন জ্বালা

বিদ্যা বুদ্ধি কিছুই কিছু না

খালি ভস্মে ঘী ঢালা

(নারদের প্রবেশ)

নারদ ॥ ওহে তোমরা কেউ বলতে পারে সমুদ্র মন্থনের কালে লক্ষ্মীর একজন বড়দিদি উঠেছিলেন তিনি কোথা গেলেন কিবা হল তাঁর ?

গণেশ - মহাভারতে আছে । খুঁজে দেখ গা

নারদ - অত বিদ্যেই যদি থাকবে তো তোমার কাছে এলেম কেন ? তুমি তো লিখেছিলে মহাভারত বল না শুনি ।

গণেশ — আমি চার হাতে টেনে লিখে গেছি এইটুকুই জানি । মহাভারত কি আমার জানা আছে শুধাও ঐ অধিকারীকে । উনি হলেন মহাভারতের ঘূর্ণি ওঁর অজানিত কিছুই নেই ।

অধিকারী - যা নাই মহাভারতে তা নাই ভূ -ভারতে ।

নারদ - কই এই ভূ - ভারত ঘুরে তো কোথাও তাঁর কোনো সন্ধান পেলেম না । এর কারণ কি?

গণেশ - দেবর্ষি তোমার চক্ষের বোধকরি কিছু দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে থাকবে ।

নারদ — চোখের দোষ কি আমারই হ'ল একার ? তোমরা তো কিছু ঠিক করে বলছো - না কোথায় তিনি কি বৃত্তান্ত । স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং মা লক্ষ্মী পর্যন্ত ভেবে অস্থির হয়েছে সঠিক কেউ কিছু বলতে পারছে না ।-

গণেশ — কি যাশ্চর্যামত : পরম ।-

-- গীত --

মন্যে , সত্যমহম লক্ষ্মী - - - - - - - ইত্যাদি ।-

নারদ - এই যা বলেছো । জোড়া দুজোড়া চার জোড়া পাঁচ জোড়া চোখ নিয়ে দেব তারাই পাচ্ছেন না দেখা , আমি তো দিনরাত লক্ষ্মীর ঘরেই পড়ে আছি ।

তুড়ি - বলি কথাটা কিরকম হ'ল , ভাল তো বুঝলেম না , জল থেকে ধূলি ওঠে কেমন করে ?

তুড়ি - ওহে জল নয় । ক্ষীর সাগর মন্থন করতে করতে ক্ষীর মরে হ'ল চাঁচি তারপর খাঁকরি হয়ে উড়তে থাকলো গুঁড়ো ক্ষীর চারিদিকে এ আর বুঝলে না ?

অধিকারী — কথা রাখ । গুরুজন সম্মুখে চাপল্য পরিহাস - যে করে তাহারে লোকে করে উপহাস । অর্থ বুঝে বল সকলকে কি কথা বললেন সিদ্ধিদাতা ।-

গণেশ - ও বাচালদের কথা ছেড়ে দাও । তুমিই ওটা ভাষায় অনুবাদ করে শুনিয়ে দাও ।

অধিকারী - দেবতা এমন আদেশ করবেন না । বড়লোকদের বাড়ী যাত্রা করেই চলছে আমার সংসার , তাঁদের ওপর কটাক্ষ যদি করিতো৷ ওই দেখেন জোনপুরী ভোজপুরী বসে আছেন, আমায় মেরে ফেললেও আমি ভাত সাপকে ঘাঁটাচ্ছিনে ।-

তুড়ি - তাই বুঝি আমাদের দুজনকে - -

অধিকারী - না গো তোমাদের কথা আলাদা । অমৃতম বালভাষিতম্ বলে হেসে উড়িয়ে দেওয়া চলে । আমরা বেলা তো সেটি হবে না বাপরে । ওমা বেম্যোময়ী, হে রাধাকান্ত । সহজ ঠাউরোনা বড়লোকের মন রক্ষা করা — ক্ষণে রুষ্ট ক্ষণে - তুষ্ট , রুষ্ট তুষ্ট ক্ষণে ক্ষণে । বুঝলে ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - ইত্যাদি ।''[১২]

১২। অবনীন্দ্রনাথ - দুঃসহ পালা - শারদীয়াদেশ ১৩৭৩ পৃ : ৩৬ -৩৭

অবনী-দ্রনাথের পৌরাণিক যাত্রায় ব্যাস বাল্মীকির জীবনাদর্শ বা কৃত্তিবাস কাশীরামের ভক্তি-ভাব বা গাম্ভীর্য্য আমরা দেখি না। মুনি ঋষি দেবতা সকলেই তাঁর তুলির খোঁচায় কৌতুক রসের উৎস হয়েছেন। কৌতুকই প্রধান ভক্তি নয়। বাঙালী ভাবমানসে ভক্তি মূলক যাত্রার যে একটি বিশেষ স্থান আছে অবনী-দ্রনাথের যাত্রায় সেই ভাব অনুপস্থিত। তাই এগুলি শৌখিন সাহিত্যিকের শখের বস্তু বাঙালী ভাবমানসের সঙ্গে এর যোগ আশাকরা বৃথা। যেহেতু পৌরাণিক চরিত্র অবনী-দ্র নাথে তরলীকৃত - সেহেতু নাটক বা যাত্রাপালায় গাম্ভীর্য্য, ওজস্বিতা বা কোনোরকম আবেগ প্রাধান্য অনুপস্থিত।

নাটক বা যাত্রাপালার অধিকাংশ একটি অঙ্কে, কখনও পাঁচটি দৃশ্যে কখনও একটি দৃশ্যে সমাপ্ত। পঞ্চ অঙ্কে বিভক্ত নাটক পাওয়া যায় না। আঙ্গিকের দিক থেকে রবী-দ্র নাথের গীতিনাট্যের সঙ্গে কোন সাদৃশ্য আশা করা যায় না। অবনী-দ্র নাথের মতে 'সচল - মনোরথ স্বচ্ছন্দ গতি পেলে সুর ও ছন্দের সাহায্যে এই ছিল যাত্রার বিশেষত্ব। থিয়েটারে সেটা ঘটানো অসম্ভব, সেটা সুসম্ভব হ'লো যাত্রার অধিকারীর কাছে।[১৩]'' এই সুর ও ছন্দই তাঁর মন অধিকার করেছিল সম্পূর্ণ ভাবে, তাই অন্যান্য আঙ্গিক তাঁর কাছে বিশেষ স্থান অধিকার করেছি। যাত্রার অধিকারী স্বয়ং অনেকক্ষেত্রে যাত্রায় উপস্থিত, তুড়ি -জুড়ি ইত্যাদির উপস্থিতি থাকলেও যাত্রার আঙ্গিকও পুরোপুরি অনুসরণ করেন নি। তাঁর নিজস্ব

১৩। অবনী-দ্র নাথ - যাত্রা ও থিয়েটার - জয়-তী উৎসর্গ - ১৩৩৮

শিল্প আঙ্গিকের মতো এও তাঁর নিজস্ব বস্তু ।-

অবনীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে যাত্রাপালাগুলো যেমন স্বগত কৌতুকে রচনা করেছিলেন, তেমনি তাঁর বাঁধনছেঁড়া কল্পনা শিল্পের বাঁধনযুক্ত হয়ে যা খুশি মেজাজের অঙ্গে তাল রেখে আত্মপ্রকাশ করেছে পুঁথি নামধেয় রচনাগুলিতে । যাত্রার রচনাকার নিজের টীকাটিপ্পনি, রঙ চড়িয়ে বর্ণনা, দর্শক পাঠকের সঙ্গে - রসালাপ ইত্যাদির যথেচ্ছ সুযোগ পান না । তার জন্যে যে স্বতন্ত্র বিষয়ের অবতারণা, অবনীন্দ্রনাথ তার সন্ধান পেয়েছিলেন কথকতার ধারায় । অবনীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর প্রকাশিত মারুতির পুঁথি চাঁইবুড়োর পুঁথি, মহাবীরের পুঁথি ইত্যাদি সেই যথেচ্ছ - বিচরণের অবাধ ক্ষেত্র । শিল্পীর সময়ের সঙ্গে শিল্পীর স্বাধীনতার সমন্বিশ্রণ এই পুঁথি গুলি ।-

শুধুমাত্র ধর্মগ্রন্থ পাঠ থেকে কথকতার আর্ট ভিন্ন ধর্মগ্রন্থ সংস্কৃতে পাঠ হয় বলে সাধারণের বোধগম্য হয় না ' কিন্তু কথকতা তেমন নয়, ইহাতে আড়ম্বর চাই - বিলক্ষণ সঙ্গীতবিদ্যা জানা চাই, বিশেষতঃ সহজেই লোকের মনস্তুষ্টি করিবার ক্ষমতা থাকা চাই । কথকতা দেশীয় সরল ভাষায় হইয়া থাকে সুতরাং সহজেই সাধারণের ভাল লাগে। ------ এখন বঙ্গদেশে যেরূপ কথকতা প্রচলিত আছে তাহা বেশীদিনের নয়, বড়জোর শতাধিক বর্ষ হইতে পারে ।[১৪] বাঙ্গালা দেশে যে কথকতা প্রচলিত তার প্রবর্তক হিসাবে দুইজনের নাম পাওয়া যায় - গদাধর শিরোমণি ও রামধন তর্কবাগীশ । এঁদের অনেকের নাম পাওয়া গেলেও রামধন তর্কবাগীশের কথকতার ধারাই বাংলাদেশে অধিক আদরণীয় হয়েছিল ,

---

১৪। নগেন্দ্রনাথ বসু - বিশ্বকোষ (৩য় খন্ড -১২৯১) পৃঃ ৫৩

কলকাতা এবং তার নিকটবর্তী অঞ্চলের কথকেরা রামধনের ঘাট অবলম্বনে কথকতা করতেন ।

ঠাকুর পরিবারে বাইরের উঠোনে যাত্রার আসরের সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃ পুরে কথকতা দেওয়ার রেওয়াজ ছিল । অবনীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর কথকতার সঙ্গে শৈশবেই পরিচিত হয়েছিলেন ''রান্নাঘরের ঠিক উপরে ঠাকুর ঘর । সেখানে ছোট পিসিমা বসে, মহিমকথক কথকতা করছেন । সেখানে হ'ত পুরাণের গল্প ।'[১৫] আবার বড় হ'য়েও দেখেছেন বাড়ীতে শোকের ঝড় বয়ে গেছে, মায়ের মনে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে কথকতার আসর বসল । - " কথকতার বেদী পাতা গেল নাচঘরে । .... খবর রটে গেল, কথকতা হবে, চললো কথকতা মাসের পর মাস ।[১৬] '' তখনকার দিনে কথকতার আদর কিছুটা ছিল ।'' কি রাজা, কি মধ্যবিত্ত, কি দরিদ্র সকলেই কথকতা শুনিতে ভালবাসিতেন । এখন আর কথকতার তেমন সমাদর নাই ।"[১৭]

বস্তুতঃ কথকতার ধারা উনিশ শতক থেকেই তার পবিত্রতা ক্রমানুয়ে হারাতে থাকে । সমাজ জীবনের বিকৃতি কথকতার ওপরেও ছায়া ফেলেছিল । সস্তা রসিকতা, ভাঁড়ামি এবং অনুপ্রাসের বাহুল্যে তার মুন্সিয়ানা, সুলভ বস্তুতে পরিণত হয়েছিল । হুতোমের ব্যঙ্গ এই অধঃ পতনের ঐতিহাসিক সাক্ষ্য —

''কথক বেদীর উপর বসে বৃষোৎসর্গের ষাঁড়ের মত ও বলিদানের মহিষের মত মাথায় ফুলের মালা জড়িয়ে রসিকতার একশেষ কচ্চেন, মূল পুঁথির পানে চাওয়া মাত্র হচ্চে,

---

১৫ ১। অবনীন্দ্রনাথ - জোড়াসাঁকোর ধারে (১ম সং) পৃঃ ৪৩

১৬ ৩। ঐ

১৭ ৪। নগেন্দ্রনাথ বসু — বিশ্বকোষ (৩য় খণ্ড -১২৯৯) পৃঃ ৫৩.

বস্তুতঃ যা বলচেন, সকলি কাশীরাম খুড়োর উচ্ছিষ্ট ও কোনটা বা স্বপাক। পূর্ব্বে গদাধর শিরোমণি, রামধন তর্কবাগীশ, হলধর পঞ্চানন প্রভৃতি প্রধান প্রধান কথক ছিলেন শ্রীধর অল্পবয়সে বিলক্ষণ খ্যাত হন। বর্ত্তমান দলে শাস্ত্রজ্ঞানের অপেক্ষা করেন না, গলাটা সাধা, চাণক্য শ্লোকের দু' এক আঁখর পাঠ, কীর্ত্তণ অঙ্গের দুটো পদাবলী মুখস্থ করেই মজুরা কত্তে বেরোন ও বেদীতে বসে ব্যাস বধ করেন।''[৫] বিংশশতকে এসে কথকতাকে জনসাধারণের মধ্যে মাঝে মাঝে খুঁজে পেলেও অভিজাত শিক্ষিত সমাজে তাকে আর দেখতে পাওয়া যায় না।

অবনীন্দ্রনাথ বিংশ শতকে কথকতাকে ধর্ম্মের অনুশাসন থেকে মুক্ত করে সাহিত্যের আসরে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তাঁর শ্রোতা ধর্ম্মরসপিপাসু প্রবীণ প্রবীণা নন, কিন্তু গল্পরস পিপাসু শিশু সমাজ। তাদের গল্প শোনার আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্তি দেওয়ার দায়িত্বে কথকতার ধারাকে তিনি পুনরুজ্জীবিত করলেন। কিন্তু পার্থক্য হ'য়ে গেল কথকের কথাবস্তুর প্রসঙ্গগত পরিবর্ত্তনে এবং উদ্দেশ্যে। কথকতার আঙ্গিক বজায় রেখে তিনি একে ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত রাখলেন কিন্তু রসের পার্থক্যে অবনীন্দ্রনাথের কথকতা নতুন যুগেররসসাহিত্যে নবীন সংযোজন রূপে পরিগণিত হ'ল।

" কথক পুরাণ কাহিনী বলেন, পুরাণ পাঠ করেন, শ্লোক আওড়াইয়া গান করিয়া নটের মত হাত ঘুরাইয়া। (কিন্তু বসিয়া বসিয়া) ধর্ম্মকথা বলেন।''[৬]

৫। কালীপ্রসন্ন সিংহ - হুতোমপ্যাঁচার নকসা - (ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত — ১৩৫৫ - পৃঃ২৫

৬। সুকুমার সেন - কথকতা-ভারতকোষ ২য়খণ্ড - (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত) পৃঃ ১৫০

রবীন্দ্রনাথ কথকতার আঙ্গিক প্রসঙ্গে বলেছেন - " কথকতা যেন অলঙ্কার শাস্ত্রমতে ন্যারেটিভ শ্রেণী ভুক্ত , তার কাঠামো গদ্যের স্থলও স্ত্রী স্বাধীনতা যুগের মেয়েদের মতোই গীতকলা তার মধ্যে অনায়াসেই অসঙ্কোচে প্রবেশ করত ।"[২৭] তাছাড়া কথকতা করবার কতকগুলি নিয়ম বা রীতি ছিল যেমন'' কথকতা করিবার প্রারম্ভে বেদীতে শালগ্রাম শিলা স্থাপন পূর্ব্বক দেবীতে উপবেশন করেন । প্রথমে মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক কথারম্ভ সূচনা করেন। মঙ্গলাচরণ সংস্কৃত বাঙ্গলা মিশ্রিত ভাষায় এবং গীত সহযোগে হইয়া থাকে । তৎপরে কথক যে বিষয়ে কথকতা হইবে তাহাই বলিতে থাকেন ।''[২৮]

অবনীন্দ্র নাথ পুঁথি রচনা কালে ঐতিহ্যগত এই আঙ্গিক মোটামুটি অনুসরণ করছেন । 'মারুতির পুঁথির' প্রারম্ভেই দেখি গন্ধমাদন পর্ব্বত মণ্ড পেতে পেতে যখন মরুত্তাশ্রমের চাঁই বুড়োর ঠেসান দেবার পেদ্দাটি , সেই সময় আশ্রমের ভোগমণ্ডপের সামনে - গাঁদাল কুঞ্জে জোড়াপেঁপে তলায় সেই গন্ধমাদনের সামনে আসন পেতে ব'সে চাঁইবুড়ো মারুতির পুঁথি পাঠের পূর্ব্বে গণ্ডূষ করছেন আর মন্ত্র পড়ছেন ।

''হুম , গণেশ চিৎপটাং তত : মারুতি চিৎপটাং
আকাশে চিৎপটাং বাতাসে চিৎপটাং
জলে জলে কাদামাটিতে চিৎপটাং ॥-

আচমন তিনবার , তারপর চারিদিকে শ্রোতাদের গায়ে শান্তিজল প্রক্ষেপ ক'রে , পুঁথির একখানি পরাণ কাঠের পাটা চিৎ করে রেখে' মারুতি বদতি" ব'লে মরুত্ত পুরাণ থেকে

২৭। রবীন্দ্রনাথ — শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সঙ্গীতের স্থান - ১৪ শ খণ্ড - রবীন্দ্রশতবর্ষ সং - পৃ: ৯১৩

২৮। নগেন্দ্রনাথ বসু - বিশ্বকোষ ৩য় খণ্ড (১২৯৯) পৃ: ৫৩

ধুয়া বচনটি আওড়ালেন —''যেখানে নাম সেখানে বদনাম —

প্রমাণ ধরো তার ভুচো - বোম্বাই আম ॥

মেয়াদ সে আমের মিষ্টি ডাকনাম অনাছিষ্টি ।''

পরে চাই বুড়ো ব্যাখ্যা করছেন —''মারুতি বলেন - নামেতে কাজ কি , রাম বলে চাখো আম ॥ --- চাই বুড়ো বল্লেন — ''কথাটা উঠবে বুঝেই স্বয়ং মারুতি পুঁথির ধূয়োতে ঐ কথাটি লিখেন । নামের ফাঁকি দিয়ে তর্ক না কর , বাপধন , মা ঠাকরুণ সকল , নাম রহস্য ক্রমশঃ প্রকাশ্য হবে পাঠের - সঙ্গে সঙ্গে । শুণ''বলে চাঁই বুড়ো বাজখাঁই সুরে গলা ছাড়লেন --

''গীত''

ভূমভয় - বারণ প্রভূত উৎপাত নিবারণ , ভকতহৃদয়হরণ রামস্ত্ব(নাম) রাম - প্রাণারাম, রাবণান্তকারী - রাম , জানকী জীবনবল্লভ রাম । রঘুবর রাম, বানরকটকমধ্যগত রাম, হনুমন্ত সেবিত-রাম ॥ ভাব লেগে চাঁই বুড়ো যেন মূর্চ্ছিত হন, এমনি ভাব দেখিয়ে আকাশে চক্ষু তুলে বল্লেন -ঐ তিনি এসে গেছেন —''মারুতির পুঁথি পাঠ হইবে যে খানে

, তাঁহার উদয় হইবে সে খানে ।''

------ অতএব বিলম্বেনালম্ - ''বলেই নান্দিপাঠ করলেন — চাঁই বুড়ো'' দক্ষিণে লক্ষ্মণোধন্বি, বামতো জানকী শুভা ।।

পুরতো মারুতির্যস্য তং নমামি রঘূত্তমম্ ॥ -''

সমস্কৃতের গমকে আসর গম্ গম্ করতে থাকলো । সুরু হ'ল আদি এবং আসল মারুতির পুঁথি পাঠ ।[২২] 'গদ্য পাঠের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতের প্রবর্ত্তনা এবং কিঞ্চিৎ অভিনয় কথকতার বৈশিষ্ট্য

২২। অবনীন্দ্রনাথ — 'মারুতির পুঁথি' — (১ম খণ্ড) — পৃঃ- ১-২

অবনীন্দ্রনাথের পুঁথিতে এই গদ্য পদ্য এবং গীতের সংমিশ্রণ প্রচুর।

''ইন্দ্র সহস্রলোচনে অশ্রুপাত করতে করতে বল্লেন নারদকে'' এর চেয়ে সোজা বানর হওয়াও যে ছিল ভালো--

বানরীতে অমরীতে যখন বাধিবে লড়াই

তখন দুইপক্ষের মাঝে প'ড়ে মরবে দেবতারাই ॥''

নারদ বল্লেন - ''ওগো বানরীগুলো অমরী নয়, রাম কাজ চুকে গেলে তার ভাবনা নেই। কিষ্কিন্ধ্যায় কিছুদিন শ্বশুর ঘর ক'রে দেখইয়া সবাই'।'ব'লেই নারদ তান ছাড়লেন —

বলি ভ্রান্ত হয়ে কি লাগিয়ে সকলে আছ।

দুই নৌকার একটা বাছ ॥

হয় কিষ্কিন্ধ্যায় বর সাজো নয় রাবণটার কাপড় কাচো।

হয় বর যাত্রার বর সাজ - নয় - অশ্বশালার যোগাও ঘাস।

হয় বানরীরে দাও বরণ মালা নয় -

মন্দোদরীরে যোগাও পুষ্পথালা

হয় বানরী - বিয়ের মন্ত্র পড়ো নয় লঙ্কায় গিয়ে

তেল বাতি ধরো ॥'' ইত্যাদি -

উপরি উর্দ্ধৃত অংশ থেকে এটিই প্রমাণিত হয় যে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর শিশু শ্রোতাদের সামনে যে রামায়ণ কাহিনী কথকতার ভঙ্গীতে উপস্থিত করেছেন তাতে কথকতার আকর্ষণীয় ভঙ্গীই প্রধান — পুরানো ধারার সঙ্গে এই টুকুই তার সম্পর্ক। কিন্তু পার্থক্য ঘটে গেছে রসের তারতম্যে। প্রাচীন কথকতায় ধর্ম্মশাস্ত্র বা পুরাণ পাঠের মধ্যে ভক্তিরসই প্রবল —

পাঠের দ্বারা বা পুরাণকথা শ্রবণের দ্বারা লোকশিক্ষা দানও এদের অন্যতম উদ্দেশ্য এবং পুণ্যকথা শ্রবণে পুন্য অর্জ্জন করাও কথকতা দেওয়ার অপর লক্ষ্য। অবনীন্দ্রনাথের কথকতায় শিশুশ্রোতের দল ভক্তিরসপ্লাবনে প্লাবিত হবে এটি আশা করা যায় না এবং লেখকের উদ্দেশ্যও তা' নয়। শুধু আখ্যান কাহিনী বর্ণনার মধ্যে দিয়ে গল্পরসকে অক্ষুণ্ণ রাখা এবং স্বচ্ছ, সহজ কৌতুকে আসর ভরিয়ে তোলা এটিই লেখকের প্রধান লক্ষ্য। অবনীন্দ্র নাথের কথকতায় ভক্তি নয়, হাস্যরসই প্রধান, সহজ আনন্দে শ্রোতাদের অবগাহন করানোই তাঁর লক্ষ্য। কথকতা তাঁর এই উদ্দেশ্য সাধনের অন্যতম সোপান, লোকশিক্ষা বা পুন্য অর্জ্জনের পথ দেখানো এখানে অবান্তর।

অবনীন্দ্রনাথের কথকতার রাজ্যে দুই জাতের চরিত্র - এক আখ্যানের অন্তর্ভুক্ত পৌরাণিক চরিত্র, অপরটি অবন - কথক সৃষ্ট ঐহিক চরিত্র। রামায়ণোক্ত চরিত্রের মধ্যে আছেন - রাম, রাবণ, লক্ষ্মণ, হনুমান, অঙ্গদ, জাম্বুবান, সুগ্রীব, শূর্পনখা কালনেমি, মহোদর, কুম্ভকর্ণ, মন্দোদরী নিকষা ইত্যাদি বহু চরিত্র। কিন্তু এঁরা সকলেই কৃত্তিবাস বাল্মীকির জগৎ থেকে চাঁই বুড়ো কথিত আখ্যানের রাজ্যে এসে নূতন রূপ পরিগ্রহ করেছেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণে বাল্মীকির নরোত্তম রাম অনেকখানি বাঙালী - হ'য়ে দেখা দিয়েছিলেন। তাঁকে ভক্তির আবরণে, অবতাররূপে রেখেও নবঘনশ্যাম কোমলরূপটিকে ঢাকা যায়নি। অবনীন্দ্রনাথের রাম - রাবণ - লক্ষ্মণ - মারুতি প্রভৃতি সকলেই নিতান্ত ঘরোয়া এবং আজকের দিনের পরিচিত মানুষ। হনুমানের ভক্তি, সাহস,

বীরত্ব , প্রভুবাৎসল্য সবই উপস্থিত আছে, কিন্তু কথক ঠাকুর একটু বাঁকা চোখে তাকিয়ে তাকে তরল পরিহাসের ভঙ্গীতে উপস্থিত করেছেন । ব্রহ্মা এখানে বিদ্যেসাগরী ঠনঠনের চটি পরেন, পবনদেব রাবণের হাওয়াগাড়িতে প্রমীলাসুন্দরীকে দু'বেলা হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে যান , ইন্দ্রাণী চন্দ্রাণী ঈশানী ব্রহ্মাণী সকলেই দেবতাদের পুনরায় বানরী বিবাহের প্রস্তাবে ক্ষুব্ধ , গৃহস্থঘরের শাশুড়ীর মতোই দেবমাতা অদিতি কনিষ্ঠপুত্র পবনদেবের বিবাহের প্রস্তাবে জিজ্ঞেস করেন'' বলি, দেওয়া থোওয়ার কি শুনি ? এজগতে পবনদেবের রোমান্টিক বায়বীয় বিয়ে ছাড়াও শূর্পনখার মশলাদার বিয়েও আছে । কনে দেখার আগে' সূর্পনখা সেজেগুজে উঁকি দেয় পর্দ্দার আড়াল থেকে বাবুই বাসা , বিবিয়ানা খোঁপা পিঠে দুলছে । বাল্মীকি কৃত্তিবাসের রামায়ণের মহাকাব্যের বীররস এখানে তরলীকৃত । অবন - কথক নীচু পর্দায় তাঁর সুরকে বন্ধ রেখে কৌতুক করেছেন, পরিহাস করেছেন, রঙ্গ করেছেন

ব্যঙ্গের কথা থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে কাহিনী এবং চরিত্রগুলোকে এঁকে চলেছেন, সুরের ছকে কথাকে বেঁধেছেন । স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে ছবি এঁকেছেন ।

মারুতির পুঁথি , চাঁইবুড়োর পুঁথিতে রামায়ণোক্ত চরিত্র ছাড়া আরও কয়েকটি চরিত্র অবনীন্দ্রনাথের কল্পনার জগৎ থেকে নেমে এসেছেন, কিন্তু বস্তুজগতের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত নয় । তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন কথক প্রবর চাঁই বুড়ো - যিনি অবনীন্দ্রনাথের অন্যান্য আরো অনেক গল্পেই গল্পকারে চরিত্রে উপস্থিত, গল্পবলাই যাঁর নেশা এবং পেশাও বোধকরি । চাঁই বুড়ো নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ কথক ঠাকুর — তারক ব্রহ্মা রাম নাম স্মরণ করে আষাঢ়ান্ত বেলায় শাস্ত্রমত তেলকালি আর লঙ্কার ধুনো দিয়ে শ্লেষ্মাশোধন করে তবে

চাঁই বুড়ো পোড়ালঙ্কার পুঁথি পাঠ শুরু করেন। আসন গ্রহণের পূর্ব্বে বলেন 'হরে মুরারে মধুকৈটভারে, আসনত্যাগকালে বলেন মধুসূদন - পুঁথি পাঠের আগে গণ্ডুষ করে মন্ত্র পড়ে শান্তিজল প্রক্ষেপ করে, ভক্তি ভরে পুঁথির পাতা খোলেন। কোনো কারণে দোষ ঘটলে পুঁথি শোধনে তাঁর নিষ্ঠার অবধি থাকে না।

চাঁই বুড়ো চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্যে তাঁর নাটুকে পনা। যেটি কথকতার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। কথকঠাকুরকে মাঝে মাঝে অভিনয় করতে হয় - শ্রোতাদের ঔৎসুক্য এবং আগ্রহকে ঘনীভূত করার জন্যে চাঁই বুড়ো কুশলী কথক এবং অভিনেতা — ভাব লেগে মাঝে মাঝে তিনি মূর্চ্ছিত হন, এমনি ভাব দেখিয়ে তিনি আকাশে চক্ষু তুলে বলেন ''ঐ তিনি এসে গেছেন" — এই ধরণের নাটুকেপনা চাঁই বুড়ো চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। মনে হয় অভিনেতা এবং কুশলী কথক অবনীন্দ্র নাথের ব্যক্তিত্বের আংশিক প্রতিফলন ঘটেছে চাঁই বুড়ো চরিত্রে।

চাঁই বুড়ো ছাড়া অবনীন্দ্রনাথ সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে আছে চাঁইবুড়োর শাকরেদ চেলারাম যে মাঝে মাঝে অনুপস্থিত গুরুর হয়ে প্রকসি দেয়, তাছাড়া শ্রোতার দলে আছেন বেঙাচির বাপ, চাড়াবুড়ি, বেঙির মা, কাবুলী - দুলুনী - প্রভৃতি নিতান্ত সাধারণ সরল গ্রাম্য শ্রোতার দল। এঁরা সকলেই অত্যন্ত বাস্তব, পরিচিত চরিত্র। কথকঠাকুর চাঁই-বুড়ো ঠাকুর্দ্দা বা দাদামশায়ের মত তামাশা করে ভয় দেখান''পরের কথা একমাঃ পরে হলে শুনক'।' বলে চাঁইবুড়ো পুঁথি তুলে প্রস্থান - - 'ঐ সূর্পনখা এলো বলে।

ব্যস আর দুলুনী কোথা আছে? কাবুলীকে জাপটে ধরে কান্না আর ফোঁপচুনী।

কাবুলীর দ্রুত পলায়ন। সভাত্যাগ কি হ'ল কি হ'ল বলে আর সকলের।'' ২৩ এখানে আমরা অনায়াসে কল্পনা করে দিই - যে কথক হিসাবে তিনি বসেছেন বেদীতে বা পিঁড়িতে, আর শ্রোতারা বসেছে অনতিদূরে মাদুর বিছিয়ে বা শতরঞ্জি বিছিয়ে, বাক্‌চাতুরী অঙ্গ ভঙ্গী আর দৃষ্টির পরিবর্তনশীল উদ্দীপনার সাহায্যে তিনি সৃষ্টি করে চলেছেন নাটকীয় আবহাওয়া শ্রোতার দল যেখানে ঔৎসুক্যে চঞ্চল।

মারুতির পুঁথির বানরের দল হাসি কান্নায় গাম্ভীর্যে চাপল্যে, অম্লে মধুরে জীবনকে ভালবেসেছে। অনাহারে মৃত্যুপণ করে যমের দক্ষিণ দুয়ারে উপস্থিত হয়ে মৃত্যু প্রতীক্ষা করেছে, কিন্তু নিরাশায় মগ্ন হয়নি, শোকে মুহ্যমান হয়নি। জাম্বুবান তখনও বলেছে —

'' যমের দক্ষিণ দ্বারে যারে বলে তারই বুঝি হবে প্রান্তদেশ এসো একবার শেষ নাচ নেচে নিয়ে, যমপুরে করা যাক প্রবেশ।''

মরিয়া হ'য়ে সবাই নাচগান ধরলে অমনি উঃ

উঃ শরীরেতে নাই ঘর্ম্ম লেশ -

হয়ে আসছে কর্ম্ম শেষ। ইত্যাদি - -

তারপরে বিচিত্র চিত্র - - -

'' সারি সারি দলের পর দল কপি বল -

মরণ জপি, গণে পল বিপল

ভূতলে অঙ্গ ঢালি, চক্ষু করি স্থির -

যমের পথ নিরখয় সকল বীর।

এই ভাবে কতক্ষণ যায় -

২৩। অবনীন্দ্রনাথ — চাঁইবুড়োর পুঁথি — (১ম খণ্ড) — পৃঃ-২৭

একে উপবাসী বানর তায় -

পিট পিট্ চোখ খুলে চায় -

ক্ষুধার জ্বালায় পেটের খোল বাজায় ।

ক্রমে কান চুলকায় ,

বদন ভেঙচে এ ওরে দেখায়'' ---- ইত্যাদি ।[২৪]

----- জাম্বুবান সুষেন বৈদ্যকে বলেন" দেখতো ঘুম এসেছে না যম এসেছে ?এটা নিদ্রাকর্ষণ না মাধ্যাকর্ষণ ? তারপরে চলে সুষেন বৈদ্যের নিপুণ ভাবে মৃত্যুর লক্ষণ বিচার । মৃত্যুর মুহূর্তে এসেও রঙ্গরসের অবধি নেই । নিদারুণ দুঃখেও তারা জীবনের প্রতি আস্থা হারায় না । সুখে দুখে সমভাবে মানসিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখে । এই হাসি, এই কান্না এই জীবন বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে নি য়েই অবনীন্দ্রনাথ দেখা দিয়েছেন কথকতার আসবে । এখানেও তাই তিনি জীবন রসিক শিল্পী ।

কথকতায় অবনীন্দ্রনাথের শিল্পের বাহন গদ্য এবং শিথিলবন্ধ পয়ার ছন্দ । পয়ার ছন্দকে ইচ্ছামত হ্রস্ব - দীর্ঘ ক'রে - শেষকালে কোনোক্রমে মিলটা জুগিয়ে একধরণের ছন্দের স্বাধীনতা আন্দোলন চালিয়ে গেছেন । এই উদার সর্ব্বংসহ ছন্দ মেজাজের বা মজার কোথাও পতন ঘটেনি - বরং পালাগানের বিশেষ সুরটিকে বজায় রাখতে পেরেছেন সর্ব্বত্র ।

২৪। অবনীন্দ্রনাথ - আরুতির-পুঁথি - (১ম অং), পৃঃ-৭১-৭২

(৫) স্মৃতিচিত্র জাতীয় গ্রন্থ - -

''আমি হলেম রূপকার , স্মৃতির মর্য্যাদা আমার কাছে অনেকখানি এবং রূপকার বলেই আমি জানি যে স্মৃতিকে রূপ দেওয়া কতখানি কঠিন ব্যাপার । [redacted] দরদের ঘেরে ধরা থাকে স্মৃতি, বিরহের ছন্দ বাঁধা নীল নবমল্লিকা সে অন্ধকারেরস্বপ্নরূপ নির্ম্মিতি । বাল্য কৈশোর - যৌবন পার হয়ে প্রৌঢ়ত্বের দ্বারে পা দিয়ে পিছন ফিরে তাকিয়েছেন অবনী - ন্দ্রনাথ , মনের পটে ধরা নানা রঙের দিনগুলিকে চিত্রিত করেছেন রূপে , রঙে , রেখায় । যে দিনগুলো রইলো না সোনার খাঁচায় , হারিয়ে গেল কালের আবর্ত্তে তাকেই অসামান্য শিল্প কুশলতায় এবং আন্তরিকতায় চিত্রিত করেছেন - আপন কথা ঘরোয়া এবং জোড়াসাঁকোর ধারে এই তিনখানি গ্রন্থে । আর 'মাসি' ছোটগল্পের সংকলন, যদিও স্মৃতিকথা নয় - কিন্তু এক মন কেমন করা অতীত এসে ধরা দিয়েছে এর পাতায় পাতায় । সাহিত্যিকের অন্তর্দৃষ্টি সংবেদনশীল মন, রূপকারের সৌন্দর্য্য দৃষ্টি এবং দক্ষ চিত্রায়ণক্ষমতা এই স্মৃতিচারণগুলিকে ক্ল্যাসিকের পর্য্যায়ে উন্নীত করেছে ।

বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনী বা আত্মচরিতের সংখ্যা নগণ্য । ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আত্মজীবনী অসম্পূর্ণ , দেবেন্দ্রনাথের আত্মচরিত সাহিত্যগুণ সম্পন্ন হলেও এটি তাঁর ধর্ম্মজীবন বিকাশের ইতিহাস, নবীনচন্দ্রের আমার জীবন' রোম্যান্টিক আতিশয্যে আকর্ষণীয় । ' রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ ঐতিহাসিক পাণ্ডিত্য ও যুগজীবনের পরিচায়ক । রবীন্দ্রনাথের জীবন স্মৃতি এবং ছেলেবেলা তাঁর পরিজন পরিবেশের এবং সঙ্গে সঙ্গে তার সাহিত্য জীবনে

১। অবনীন্দ্রনাথ - জগদীন্দ্রনাথের স্মরণে' — মানসী ও মর্ম্মবাণী - ১৩৩৩, ফাল্গুন -পৃ২০-২১

অনুপ্রবেশ ও বিকাশের কাহিনী। অবনী-দ্রনাথের আপন - কথা, ঘরোয়া এবং জোড়াসাঁকোর ধারে ইতিহাস নয়, জীবনী চিত্রের কালানুক্রম রক্ষাও এর ধর্ম্ম নয় এরা জীবনের ছবি - মনের পটে ধরে রাখা ' জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে - তাহা কোন এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা। তাহাতে নানা জায়গায় নানা রঙ পড়িয়াছে, তাহা বাহিরের প্রতিবিম্ব নহে, সে রঙ তাহার নিজের ভাণ্ডারের, সে রঙ তাহাকে নিজের রসে গুলিয়া লইতে হইয়াছে, সুতরাং পটের উপর যে ছাপ পড়িয়াছে তাহা আদালতে সাক্ষ্য দিবার কাজে লাগিবে না।'' [২] ঘরোয়া এবং জোড়াসাঁকোর ধারে জীবন স্মৃতির এই সত্যে বিধৃত, কাজেই বাংলা সাহিত্যের আত্মজীবনীর ইতিহাসে এদের স্থান স্বতন্ত্র।

ঘরোয়া এবং জোড়াসাঁকোর ধারে অবনী-দ্রনাথের পরিণত বয়সের রচনা, এদের প্রকাশ যথাক্রমে ১৩৪৮। ১৩৫১; কিন্তু এদের আগে লেখা ১৯২৭, খৃঃ বসুমতী পত্রিকায় প্রকাশিত আপন কথা'। মনের কথা, পদ্মদাসী, সাইক্লোন, উত্তরের ঘর, এ আমল সে আমল, এবাড়ি ও বাড়ি, অসমাপিকা, বসতবাড়ী প্রভৃতি আপন-কথার বিভিন্ন প্রসঙ্গ। ধারা - বাহিক শৈশব জীবন নয়, কিন্তু যে সমস্ত ঘটনা বা মানুষ অবনী-দ্রনাথের শিশুমনে ছাপ রেখে গেছে, এ কাহিনী তারই উজ্জ্বল বর্ণনা। অলঙ্কার বিহীন সহজ ভাষায় এরা অবনী-দ্র - নাথের শৈশব জীবনের কয়েকটি অধ্যায় কে যেনে ধরেছে। যে অবন - ঠাকুর বন্দী থাকতেন তেতলার মস্তঘরে - জাহাজের মত একটা বড় খাট আর বাইরের জানালা দিয়ে যেরা আকাশ যাঁর ছোট জগতের সীমা ছিল — শিশু শ্রোতাদের কাছে এটি সেই অবন ঠাকুরের গল্প।

২। রবী-দ্রনাথ — জীবনস্মৃতির ভূমিকা - শতবার্ষিক রচনাবলী - ১০মখণ্ড পৃঃ- ৫

আপন কথার অবনী-দ্রনাথকে নৈসর্গিক প্রকৃতির থেকে বেশী আকর্ষণ করেছিল দৈনন্দিন জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলী। তেতালার জানালা দিয়ে দেখা যে সব ঘটনা মনে ছাপ ফেলে গিয়েছিল 'আপনকথা' তারই স্মৃতি।

'ঘরোয়া' সম্পর্কে রবী-দ্রনাথ বলেছিলেন'' বোধহয় আজকের দিনে আর দ্বিতীয় কোন লোক নেই যার স্মৃতি চিত্রশালায় সেদিনকার যুগ এমন প্রতিভার আলোকে প্রাণে প্রদীপ্ত হয়ে দেখা দিতে পারে - এতো ঐতিহাসিক পাণ্ডিত্য নয়, এযে সৃষ্টি - সাহিত্যে পরম দুর্লভ।''[৩] ঘরোয়ার বিষয়বস্তু বিশাল ঠাকুর পরিবারের বিভিন্ন পরিজন ও পরিবেশ। নাচে - গানে অভিনয়ে শিল্পে শখ এবং শৌখিনতায় যে যুগ ছিল ভরপুর আনন্দে উচ্ছ্বসিত, ঘরোয়া সেই প্রসন্ন দিনের, প্রসন্ন জীবনের কাহিনী। অবনী-দ্রনাথ নিজে এখানে অনুপস্থিত, কিন্তু যে যুগ তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল, যাঁরা তাঁর চারপাশে থেকে তাঁকে প্রদীপ্ত করেছিলেন, স্মৃতিই তার প্রাণ। সার্থক প্রতিকৃতি শিল্পীর মতই তিনি কালের পটে এক একটি চরিত্রকে এঁকে দিয়েছেন।

জোড়াসাঁকোর ধারেতে অবনী-দ্রনাথ নিজের পরিবারের অর্থাৎ বাবা - মা ভাই - বোন - পরিজন - পরিচারক প্রভৃতির কাহিনীর সঙ্গে নিজের বিভিন্ন শখ এবং শিল্পচর্চ্চার ইতিহাস বিবৃত করেছেন। বাবা গুণে-দ্রনাথ - তাঁর শিল্প রসিক সৌন্দর্য্যপ্রিয় মন এবং শৌখিনতা নিয়ে ধরা দিয়েছেন অবনী-দ্রনাথের স্মৃতিতে। উনিশ শতকের অভিজাত সমাজের সদরমহল আর চাঁদর মহলের কাহিনী, গান বাজনা, শখের থিয়েটার, সাহিত্য চর্চ্চা, শিল্প চর্চ্চা, পায়রা ওড়ানো, লোক খাওয়ানো, যাত্রা - কথকতা - কীর্ত্তনের আসর, স্বদেশী মেলা, স্বদেশীয়ানা কিছুই বাদ পড়েনি। বিশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যযামে এসে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখা সেই

৩। রবীন্দ্রনাথ— 'অবনীন্দ্রনাথের ঘরোয়া' – প্রবাসী– ১৩৪৮, কার্ত্তিক–

প্রসন্ন আনন্দময় জীবনকাব্য রূপকথার মতই অপরূপ হয়ে উঠেছে। উভয় গ্রন্থেই সমসাময়িক ইতিহাস রূপকথায় রূপান্তরিত। কারণ ঊনবিংশ শতকের পল্লী কলকাতার থেকে আজকের দিনের যান্ত্রিক কলকাতার প্রভেদ এই যুগেই জন্মান্তরের মত। সেদিনের নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বিগ্ন, প্রসন্ন, সংহত জীবন থেকে আজ আমরা গতিময় খন্ড, বিচ্ছিন্ন জীবনে নিক্ষিপ্ত হয়েছি। তাই সেদিনের বাস্তব কাহিনীর অঙ্গে আজকের বস্তুগত জীবনের রঙের প্রভেদ ঘটে গেছে। এই রসভেদের সুযোগে বাস্তব কাহিনী ও রোম্যান্টিক + দূরত্বে রূপকথার স্বাদ দিতে সক্ষম হয়েছে।'' রূপকথার ওস্তাদ শিল্পীর কলম তুলির স্পর্শে এই বাড়ীর কর্তা গিন্নি আত্মীয় অনাত্মীয় চাকর দাসী রায় গাছপালাগুলি পর্যন্ত জীবন্ত, রূপকথার অলৌকিকতায় সমৃদ্ধ।''[৫]

'ঘরোয়া' এবং জোড়াসাঁকোর ধারে রসবিচারে একই গোত্রের হ'লেও উভয়ের পার্থক্য আছে ঘরোয়ার স্বাতন্ত্র্য তার স্বতঃস্ফূর্ত আবেগময় ভাষায়, আন্তরিকতা, অন্তরঙ্গতা এবং প্রাণময়তায়। 'ঘরোয়ায়' খুঁজে পাই আমরা সেই গল্প বলিয়ে কথক অবনীন্দ্রনাথকে যিনি আপনার বিশিষ্ট ভঙ্গীতে গল্প বলে চলেছেন। তিনি এখানে সচেতন শিল্পী নন, যিনি কিছু গ্রহণ, কিছু বর্জন করে জীবনের ইতিহাসকে সাজিয়ে গুছিয়ে অধ্যায়ে পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে তুলে ধরেন। তাই ঘরোয়ার ভাষা একান্তই মৌখিক ভাষা। বাংলা সাহিত্যে এ'জাতীয় মৌখিক ভাষায় রচিত গ্রন্থ বোধকরি আর নেই। কারণ অবনীন্দ্রনাথ নিজে লেখেন নি বলে গেছেন মাত্র -- আর তাকেই শ্রুতিধরীর মত কলমের ডগায় তুলে নিয়েছেন, শ্রীমতী রাণী চন্দ। এই সহজ, প্রাণময়, অন্তরঙ্গতা জোড়াসাঁকোর ধারেতে অনুপস্থিত।

এদিক দিয়ে 'ঘরোয়া' সমগ্র বাংলা সাহিত্যে অন্যন্য।-

৫। প্রমথনাথ বিশী - বাংলার লেখক - (১ম সং) -- পৃঃ ১১১

'জোড়াসাঁকোর ধারেতে' অবনী-দ্রনাথ সচেতন শিল্পী সাজিয়ে গুছিয়ে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। এই সাবলীল সুলভ মনোভাব জোড়াসাঁকোর ধারেকে অনেকখানি কৃত্রিম করে তুলেছে। ঘরোয়ার মত প্রাণের অত কাছাকাছি এসে পৌঁছয় না। উভয় গ্রন্থের স্বাদ এক হলেও এই পার্থক্য লক্ষণীয়।

অবনী-দ্রনাথের 'ঘরোয়া' এবং জোড়াসাঁকোর ধারে সমসাময়িক যুগের সামাজিক মনের পরিচয় দেয়। নব্য বঙ্গ সংস্কৃতির সামাজিক ইতিহাসের দলিল হিসাবে এদের মূল্য স্বতন্ত্র। কিন্তু সামাজিক মূল্য যাই থাক না কেন যেটি গৌণ, সাহিত্যিক মূল্যে এরা মুখ্যস্থান অধিকার করে আছে।

ঘরোয়া এবং জোড়াসাঁকোর ধারে অবনী-দ্রনাথের শৈশব যৌবনের স্মৃতি, বার্ধক্যের সান্ত্বনা। এর ভেসে আসা স্মৃতিতে কখনো আনন্দের রঙ, কখনো বেদনার। পিছন ফিরে তাকিয়ে ফেলে আসা দিন গুলোর প্রতি অজস্র মমতায় পরিপূর্ণ অবনী-দ্রনাথের মন। হারিয়ে যাওয়ার বেদনায় এর আকাশ ভারাক্রান্ত। প্রচ্ছন্ন বেদনার রসে এ কাহিনী করুণ বিরহব্যথায় নীল এর রঙ।